সূচিপত্র

কালিদাস রচনাসমগ্রের ভূমিকাপর্ব

কালিদাস রচনাসমগ্রের ভূমিকা লেখার আগে, বর্তমান প্রবন্ধটির একটি ভূমিকা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আজ থেকে প্রায় ছাপ্পান্ন বছর আগে সুরসিক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তিনটি খণ্ডে তাঁর 'কালিদাস গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ) সম্পাদন করেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ, কালিদাস গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় এক জায়গায় জানিয়েছিলেন, 'কালিদাস গ্রন্থাবলীর ভূমিকাভাগ, কাশী রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ. মহাশয়ের লিখিবার কথা ছিল এবং প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে উক্ত অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমেই সেকথা লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের অবসর প্রাচুর্যের ঐকান্তিক অভাবে, ক্রমেই কালবিলম্ব ঘটিতে লাগিল, হয়তো এরূপ বিলম্বের ফলে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিয়া যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না, ভাবিয়া—আপাতত সে দুরাশা পরিত্যাগ করিতে হইল। কালে, যদি সুযোগ ঘটে তবে পৃথকভাবে 'কালিদাসের ভূমিকা'—এই নামে এক খণ্ড পুস্তিকা প্রকাশের বাসনা রহিল।'

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, 'কালিদাসের ভূমিকা' লেখার কথা ছিল, মহামহোপাধ্যায় অধ্যক্ষ ড. গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের। যিনি পাণ্ডিত্যের এক কিংবদন্তী পুরুষ। যাঁর জন্ম-শতবর্ষ পালিত হ'ল ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বিপুল কর্মব্যস্ততার জন্য এ কাজটি করতে পারলেন না। দ্বিতীয়ত, কলকাতা সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সুযোগ্য ও সুরসিক অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'বাসনা'ও চরিতার্থ হ'ল না। 'কালিদাস', 'শ্রীকণ্ঠ', 'কালিদাস ও ভবভূতি,' 'তপোবন' এবং 'কালিদাস গ্রন্থাবলী' ও আরও অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনার পর তিনিও হয়তো আর সময় পেলেন না। তারপর দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হ'ল।

এবার পাঠকের ঠোঁটে ভ্রূকুটি-কুটিল হাসি দেখা দেবে। কোথায় সেই মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত এবং কাব্যরসরাজ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ, আর কোথায় সেই 'ভূমিকাপর্ব'-র বর্তমান লেখক! দুটি—"কোথায়" শব্দের দিঙ্‌নিরূপণে, কালিদাসেরই কথা মনে পড়ে। মহাকবির পরিণত প্রতিভার সংস্করণ 'রঘুবংশ'র সূচনা-শ্লোকগুলির দ্বিতীয়টিতে তিনি বলছেন, 'কোথায় সেই মহান সূর্যবংশ আর কোথায়ই বা আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধি! আমি অজ্ঞানবশত যেন কলার ভেলায় দুস্তর সমুদ্র পার হতে চলেছি।' তারপর কবি, সান্ত্বনার এক সূক্ষ্মপথ আবিষ্কার করে জানালেন, সুচের সরু ছিদ্রপথে সুতোকে প্রবেশ করিয়ে যেমন একের পর এক মণির দ্বারা মূল্যবান মালা গাঁথা যায়— আমিও, বাল্মীকি প্রমুখ কবি-মনীষীদের তোরণ-পথ ধরে দুরূহ রঘুবংশের বর্ণনা করব।

একথা মহাকবির সাজে। কিন্তু 'ভূমিকাপর্ব'-র লেখক কি বলবে? একটিমাত্র কথাই সে বলতে পারে— দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী সময় গড়িয়ে গেল, কোন অঞ্চল থেকে কোন সত্যিকারের সাহিত্য-রস-পিপাসু, এই বিষয়ের রসে মজলেন না কেন? কেন অত বড় ভারতীয় কবির রচনা-গুলির পূর্ণাঙ্গ একটা রসবস্তু-তদন্ত হ'ল না? আর যা হ'ল, সেটাও শুধু-মাত্র গ্রান্থিক উৎসের অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতায় বিদ্যায়তনিক পাঠ্যক্রমের ভারসাম্যেই আটকে রইল! সমালোচকরা বললেন—'কালিদাস বাচ্যাতি-শায়ী ব্যঙ্গভাবের কবি, কালিদাসের এই ভাবটিই সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোত্তম অলঙ্কার।' বাচ্যাতিশায়ী-ব্যঙ্গভাব তো শুধু অভ্যন্তরীণ প্রমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অভ্যন্তরীণ প্রমাণের গণ্ডি পেরিয়েও সে তো দেশ-কাল-পাত্রের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সীমাকেও স্পর্শ করতে চায়। শুধু গ্রান্থিক উৎসের ভূমিকা, সে তো পরীক্ষা-প্রশ্নোত্তরী বৈতরণী পেরোনোর নির্ধারিত ছাত্রের খাদ্য। কিন্তু কবির জীবন-যৌবন-প্রেম, সুখ-দুঃখ, তিক্ত অভিজ্ঞতায় লাঞ্ছিত বার্ধক্য—এই বিষয়গুলিও তো খুঁজে বের করতে হবে তাঁর রচনাসমগ্রের ভূমিকাপর্ব থেকেই। তবেই 'বাচ্যাতিশায়ী-ব্যঙ্গভাবের কবি'র পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান সম্ভব হবে। কবি যা বলতে চান, তার অন্তরালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও আছে, যাকে বুঝি-বুঝি করেও বুঝে ওঠা যায় না। সেই দুর্বোধ্য-অস্থিরতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে কবির না-বলা কথার মূল ভূমিকা। তারপর তো "ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ"—এই জনশ্রুতির অনুগত হয়ে কবিকে

গ্রান্থিক উৎসের তত্ত্ব-তালাশে মেতে উঠতে হয়। মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের বোঝান—শকুন্তলার ভূমিকা মহাভারত, রঘুবংশের ভূমিকা রামায়ণ, কুমারসম্ভবের ভূমিকা শিবপুরাণ, মেঘদূতের ভূমিকা— এই মরেছে! দেখি একবার মল্লিনাথ কি বলেছেন !

মল্লিনাথ সূরী, কালিদাসের অসাধারণ (?) এক ভাষ্যকার। দাক্ষি-ণাত্যের দেবপুরে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। দেবপুর, কোলাচলের অন্তর্গত। তাই তিনি, সূরী মল্লিনাথ কোলাচল ভট্ট। বিভিন্ন কবির কাব্যাবলীর টীকা বা ভাষ্য লিখতে গিয়ে, বিভিন্ন নাম দিয়েছিলেন ভাষ্যগুলির। যেমন, ভারবি কবির 'কিরাতর্জুনীয়ম্' কাব্যের ভাষ্যের নাম 'ঘণ্টাপথ'। শিশুপালবধ কাব্যের 'সর্বংকষা' ভাষ্য, নৈষধ চরিত্রের 'জীবাতু' ভাষ্য, ভট্টিকাব্যের 'সর্বপাঠী' টীকা আর কালিদাসের 'সঞ্জীবনী' টীকা। এই সঞ্জীবনী টীকার ভূমিকায় মল্লিনাথ বলেছিলেন —'কালিদাসের বাণী আজ দুর্ব্যাখ্যারূপ বিষক্রিয়ায় মূর্ছাগ্রস্ত, আমার এই 'সঞ্জীবনী' ব্যাখ্যাই তাকে উজ্জীবিত করে তুলবে।' তিনি আরও বলেছেন—'মল্লিনাথ জড়বুদ্ধি পাঠকদের অনুগ্রহের জন্য কালিদাসের কাব্যত্রয় নির্মলভাবে ব্যাখ্যা করছেন।'

বর্তমানের পটভূমিকায় মনে হয়, মল্লিনাথের যুগাবসান হয়েছে। কারণ, যারা জোর করে কালিদাস পড়তে চায় বা পড়াতে চায় তারাই কালিদাসের দুর্ব্যাখ্যায় বিষমূর্ছিত কিংবা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু বিগত দেড়শ বছর ধরে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যাঁরা কালিদাস পড়ছেন বা পড়াচ্ছেন, তারা কাব্য-সাহিত্যের প্রেমিক হিসাবেই কালিদাসের প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন। সুতরাং মল্লিনাথের সঞ্জীবনীর বোধহয় আর প্রয়োজন নেই। কাব্যের ভাষ্য লেখার আগে তিনি আবার নৈয়ায়িক হিসাবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাঁর সমগ্র ভাষ্যাবলীতে নৈয়ায়িক-লক্ষণ সুস্পষ্ট। নৈয়ায়িকের প্রধান কাজ, খণ্ডন-অখণ্ডন তত্ত্বের বিচার। কালিদাসের ভাষ্যকার হতে গিয়েও, মল্লিনাথ প্রকৃতপক্ষে নৈয়ায়িক হিসাবেই পদসঞ্চার করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি 'মেঘদূত'কে দ্বিখণ্ডিত করা। মেঘদূত 'খণ্ডকাব্য' হলেও (খণ্ডকাব্য হ'ল, মিষ্টি বা মধুর কাব্য, আংশিক কাব্য নয়), নৈয়ায়িকের হাতে খণ্ডিত হওয়া বড়ই বেদনার বিষয়। মেঘ দুই খণ্ডে বিভক্ত হ'ল, মল্লিনাথের হাতে। পূর্ব মেঘ ও উত্তর মেঘ। কালিদাসের কাব্যে দ্বিধাবিভক্ত মেঘের আভাস কোথাও নেই।

নৈয়ায়িক পণ্ডিত খণ্ডন-অখণ্ডন তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করার জন্যই হয়তো পূর্ব-মেঘ ও উত্তরমেঘ-এ দ্বিখণ্ডিত করলেন কাব্যটিকে। সেই দ্বিখণ্ডিত মেঘ-দূত এখনও নৈয়ায়িকের যুক্তিকেই শিরোধার্য করে চলে আসছে, ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের কালি-কলম-মনে। তাই মেঘদূতের ভূমিকা খুঁজতে গিয়ে অনেককেই হতে হয় বিড়ম্বিত। সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ হোক বা ত্রুটিমুক্ত হোক, 'ভূমিকাপর্ব'-র লেখক এইটুকুই বলে সান্ত্বনা পাবে— যে-কাজটা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে কোন কারণেই হোক হয়ে ওঠে নি, সেই কাজটা অন্তত শুরু হোক। সাহিত্যে তো একটা বিরাট হাতিয়ার আছেই। সেই হাতিয়ারটা হ'ল—'ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা'। লেখকের বুদ্ধিবলের ওপর নির্ভর করেই কাব্যসাহিত্যের ব্যাখ্যা সুন্দর-সুন্দরতর-সুন্দরতম হয়ে ওঠে, আবার অসহায়-অপাংক্তেয় অবস্থাতেও কাব্যের ব্যাখ্যা—'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। সুতরাং শুরু হতে আপত্তি কি !

বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাজ্ঞ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন বিদগ্ধ কালিদাস-গবেষক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মধ্য-প্রদেশের উজ্জয়িনী নগরীতে, শিপ্রা-বেত্রবতী-গম্ভীরা-গন্ধবতীর তীরে তীরে, দশপুর গ্রামের চতুঃসীমায়, দেবগিরি পাহাড়ের গিরিপথে বিহস্ত-বিহারীর মতো অক্লান্তভাবে ঘুরেছেন। খুঁজেছেন, কালিদাসের জীবন ও কাব্যের নানা নথি। কালিদাসের কাব্যের বিচিত্র ভাবনা নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়াও বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের প্রাচ্য-বিদ্যা-গবেষণা কেন্দ্রের মুখপত্রে (JBORS) ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করেন। তার মধ্যে একটি হ'ল —"The Chronology of Kalidasa's work and His Learning."— কালিদাস রচনাসমগ্রের আনুমানিক কালক্রমের ইতিহাস আলোচনা, উক্ত প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু। মহাকবির চিন্তাধারার ভিন্নমুখিতা এবং বিচিত্র বাগভঙ্গির ক্রম-পরিণতি তথা উৎকর্ষের আঙ্গিক থেকেই শাস্ত্রীমশাইয়ের উক্ত প্রবন্ধটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। বর্তমানে আমরা শাস্ত্রীমশাইয়ের কালিদাস রচনাসমগ্রের আনুমানিক ক্রমটিকেই অনুসরণ করে ভূমিকাপর্বের সূচনা করব।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সেই ক্রমটি এইরূপ— কালিদাসের প্রথম রচনা, ঋতুসংহার কাব্য। ক্রমান্বয়ে— মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটক, মেঘদূত-খণ্ডকাব্য, বিক্রমোর্বশীয়-নাটক, কুমারসম্ভব-কাব্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলম-নাটক এবং

সর্বশেষ রচনা রঘুবংশ-কাব্য। এই হ'ল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণায় কালিদাসের রচনাক্রম। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। শেষের দুটি রচনা গভীরভাবে পড়লে বোঝা যায় কবি রঘুবংশের আগেই অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক রচনা শুরু করেছিলেন। বেশ কিছুটা লেখার পর তিনি রঘুবংশে হাত দেন। শকুন্তলা স্থগিত থাকে। তারপর আবার একই সঙ্গে দুটি রচনাই চলতে থাকলো। আবার শকুন্তলার কাজ বন্ধ হয়ে রঘুবংশেরই কাজ এগিয়ে চলে। একনাগাড়ে রঘুবংশ শেষ হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যেই শকুন্তলার শেষাংশটি শুরু করেন এবং শকুন্তলা নাটক সমাপ্ত হয়। ভূমিকাপর্বের আলোচনায় উক্ত বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দুই

কালিদাস রচনাসমগ্রের প্রতিটি কাব্য-নাটকেই কমপক্ষে দুটি ভূমিকার স্তর আছে। প্রথমটি গ্রান্থিক-উৎস এবং দ্বিতীয়টি কবির কালের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্তর। প্রতিটি রচনার মধ্যে এই দুটি স্তর কিভাবে কার্যকরী হয়ে উঠেছে, তার অনুপুঙ্খ বিচারের প্রয়াস নেওয়া হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কালিদাসের রচনা সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ক্রমানুসারিক ইতিহাসটিই আমরা এখানে গ্রহণ করব। যদিও অনেক পণ্ডিতের মত 'ঋতুসংহার' কাব্যটি কালিদাসের রচনা নয়, তথাপি শাস্ত্রীমশাই কালিদাসের প্রথম রচনা হিসাবে ঋতুসংহারকেই চিহ্নিত করেছেন। যাঁরা ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা নয় বলে মনে করেন, তাঁদের প্রথম যুক্তি হ'ল, এ-রচনা দুর্বল-লেখনীর উৎপাদন। কালিদাসের লেখনীতে এতো বিপুল দুর্বলতার কোন অবকাশ নেই। তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তি আরও কৌতূহলোদ্দীপক। কালিদাসের স্বনামধন্য ভাষ্যকার মল্লিনাথ কোলাচল ভট্ট ঋতুসংহারের কোন টীকা প্রণয়ন করেন নি। এর উত্তরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিশ্লেষণটি যথার্থ। তিনি বলেছেন— নতুন কবির নতুন দর্শনজাত কাব্য-রচনার কৌশলের মধ্যে দুর্বলতারআভাসটিই সত্য ও যথাযথ। কিন্তু ঋতু-সংহারের মধ্যে যে প্রাকৃতিক-সচেতনতা ও এক অনুপম আলেখ্য দর্শনের

ইঙ্গিত আছে, সেটি বড় কবির চিন্তা-চেতনারই বিষয়বস্তু। এছাড়া কালিদাসের বহুল-পরিচিতির অন্যতম কারণ হিসাবে শৃঙ্গার রসের ও নায়ক-নায়িকার মিলনের যে-চিত্র, সেটি প্রকৃতপক্ষেই ঋতুসংহারে সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং দুর্বল লেখনীর অজুহাতে ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা-তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, টীকাকার মল্লিনাথ তো স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, কালিদাসের কাব্যের দুর্ব্যাখ্যায় বিষমূর্ছিত পাঠকদের সঞ্জীবিত করার জন্যই তাঁর তিনটি কাব্যের 'সঞ্জীবনী' টীকা তিনি প্রণয়ন করেছেন। তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ-সরল-অনাড়ম্বর ঋতুসংহারকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা তাই মল্লিনাথ অনুভব করেন নি। শাস্ত্রীমশাইয়ের এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধে ভারততত্ত্ববিদ ম্যাকডোনেল সাহেবের একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে—'Perhaps no other work of Kalidasa's manifests so strikingly the poet's deep sympathy with nature, his keen powers of observations and his skill in depicting an Indian landscape in vivid colours.' ম্যাকডোনেল অবশ্য এই উক্তিটির মধ্যে একটু অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হয়েছেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাই বলেছেন— 'ঋতুসংহার কাব্যখানি এতদূর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত না হইলেও, কালিদাসের রচনার মূল লক্ষণগুলি যে ইহাতে অপরিণত অবস্থায় বিরাজমান, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।'

বৈদিক সাহিত্যেই সর্বপ্রথম ঋতুবর্ণনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের বিভিন্ন খণ্ডে বর্ষা-বসন্তের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। মহাকবি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত ঋতুর যে বৈভবময় বর্ণনা করেছেন তা এককথায় অপূর্ব। মহাভারতে বেদব্যাসও ঋতুবর্ণনা করেছেন, কিন্তু বর্ণনার বর্ণালী-আতিশয্য সেখানে কম। এছাড়া আছে মন্দশোর-শিলালিপিতে খোদিত ঋতুবর্ণনার বিবিধ আভাস। পশ্চিম মালবের অন্তর্গত গ্রাম, দশপুর কালক্রমে—মন্দদশপুর, দশোর ও মন্দশোরে পরিণত হয়েছে। অনেক পণ্ডিতের মতে এবং বিশেষ করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, পশ্চিম মালবের এই দশপুর গ্রামেই

মহাকবি কালিদাসের জন্ম হয়েছিল। আনুমানিকভাবে কালিদাসের জন্মসাল পঞ্চম শতাব্দী অর্থাৎ ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ড. এন. এন. সাহা বলেছেন—'Many evidences have been advanced by Sastriji in favour of his view that Kalidasa flourished in the latter half of the period between 404 and 533 A. D.' যদি কালিদাস ঐ সময়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাঁর সৌভাগ্য এই যে, মন্দশোর শিলালিপির আবিষ্কারটিও হয়েছিল ঐ সময়ের মধ্যেই। ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে যে লেখমালা আবিষ্কৃত হয়, সেখানে ছিল বর্ষা ঋতুর বর্ণনা। ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দের আবিষ্কৃত লিপিতে পাওয়া যায় শরতের বর্ণনা। ৪৭৩ এবং ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের লেখমালায় আবিষ্কৃত হয় বসন্তের বর্ণনা। মন্দশোর, লেখমালার যাঁরা আবিষ্কারক তাঁরা হলেন গুপ্ত রাজবংশের পণ্ডিত-প্রত্নতাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ। এই মন্দশোর লেখমালা কালিদাসকে ঋতুসংহারের প্রস্তুতির জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কালিদাস যখন ঋতুসংহার রচনা করেন তখন তাঁর কিশোরোত্তীর্ণ নবযৌবনের সদ্য সূচনা হয়েছে। কবিরা এমনই একটু ভাবপ্রবণ। তার ওপর নতুন যৌবনের দুর্বার আকর্ষণ তাঁকে রমণী-প্রিয়তায় মুগ্ধ করে তোলে। দশপুরের গ্রামকে ছুঁয়ে যাওয়া গম্ভীরা নদীর শান্ত-স্নিগ্ধ-সলিলে কামিনীদের জলকেলি, তাকে দর্শন এবং কামিনীদের সঙ্গে স্নানের অংশীদার হয়ে একান্তভাবে একাত্ম হওয়া কবির পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। দশপুর জনপদের ফুল-ফল-পাখি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ভূ-পরিবেশ— এসবই ঋতুসংহারের বর্ণনার মধ্যে পুনরুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। তার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত মানসিকতার এক তরুণের দৃষ্টি-কোণ, কামিজনের চিত্তবৃত্তির নিপুণ আলেখ্যে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে ঋতুসংহারের ভূমিকায়।

ঋতুসংহার জনপ্রিয় কাব্য হয়ে উঠল না। শুধুমাত্র দেশের প্রাকৃতিক গম্ভীর বিবরণে সীমাবদ্ধ কাব্যের জনপ্রিয়তা সম্ভবও নয়। তাই 'দেশপ্রেম'-এর অর্ঘ নিয়েই কাব্যের উপাদান তৈরি করতে হবে—এই মনে করে কবি তাঁর প্রথম নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-র প্রস্তাবনায় সূত্রধরের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানালেন—'আজ এই বসন্তোৎসবে,

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক অভিনয় করার জন্য এই সভার দ্বারা আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। কালিদাস সেই নাটকের অভিনেয় বিষয়গুলি সাজিয়েছেন। এখন তাহলে সঙ্গীত আরম্ভ হোক।' সূত্রধারের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতার প্রতিনিধি-চরিত্র, পারিপার্শ্বিক বললে —'কখনই না, কখনই না। ধাবক (ভাস), সৌমিল্ল প্রমুখ কীর্তিমান কবি-নাট্যকারদের নাটক ছেড়ে অতি আধুনিক নবীন কবি কালিদাসের নাটক দেখাবার কি কারণ থাকতে পারে?' তারপর সূত্রধারের কথাটি, কবির অন্তর্দাহমথিত দুঃখ ও মৃদুরাগের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে এক অসাধারণ বিবেচনাবোধ ও আবেগের মধ্য দিয়ে। কবি, সূত্রধারের মাধ্যমে দর্শক-জনতাকে শোনালেন, 'ছিঃ ছিঃ! নির্বোধের মতো কথা বলছ কেন? ভেবে দেখ— যা কিছু পুরনো সে সবই ভালো আর যা কিছু নতুন তাই নিন্দনীয়— এটা একটা নিয়মই হতে পারে না। যাঁরা সত্যিকারের জ্ঞানী তাঁরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ভালো-মন্দ বিচার করেন, পরের মুখের কথা শুনে করেন না।' কালিদাসের মূল উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। —'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কবির প্রথম নাটকের প্রাথমিক ভূমিকায় রয়েছে, ঋতুসংহারের ব্যর্থতা ও দুর্মুখ সমালোচনা। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে, প্রথম নাটক রচনার পরেও কিন্তু কবির সঙ্গে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কোন যোগাযোগ বা পরিচিতি হয় নি। দেশপ্রেমের নাটক হিসাবে নায়িকা মালবিকার অবতারণার পেছনে তাঁর জন্মভূমি পশ্চিম মালবের একটা-দিক পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে, নায়ক-নায়িকার মিলন-সম্ভোগের নিছক দেহ-সর্বস্ব এক প্রতিবেদন। তবু বলা যায়, দেশপ্রেমের আঙ্গিকে মালবিকাগ্নিমিত্র একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার ভূমিকায় সমৃদ্ধ নাটক। মৌর্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্থাপনের ইচ্ছায় নিজের প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করে পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অগ্নিমিত্রের বংশই 'মিত্রবংশ' নামে ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অগ্নিমিত্র যখন বিদিশা রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন বিদর্ভরাজ্যে অন্তর্বিপ্লব তথা গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। সেই সুযোগে বিদর্ভের বিবদমান রাজাদের অন্যতম মাধব সেন, পরাক্রান্ত অগ্নিমিত্রের সাহায্যে

বিদর্ভ রাজ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে তৎপর হয়ে ওঠেন, শুধু তাই নয়, নিজের ছোটবোনকে অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণ করে মিত্রতা-সূত্রেও আবদ্ধ হন। সেই মাধবসেন-ভগিনী, রাজকুমারী মালবিকাই এই নাটকের নায়িকা। ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের এই পরিলেখকে অবলম্বন করে কালিদাস নায়ক-নায়িকার যুক্ত নামকরণে "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক প্রণয়ন করেন।

এই নাটকের ঐতিহাসিক ভূমিকার পর আমরা এর সামাজিক ভূমিকাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করব। সুন্দরী রমণীর সন্ধান পেলে তাকে রাজ-অন্তঃপুরে বন্দী করে ভোগ করার চেষ্টাটিই রাজতন্ত্রে সমস্ত প্রভুদের প্রধান কীর্তি। এই বিষয়টি সম্পর্কে কালিদাস ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই এই নাটকে সেই সত্যটি কবি অবলীলা-ক্রমেই ব্যক্ত করতে পেরেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মহারাজ অগ্নিমিত্র জানতে পারেন নি যে, মালবিকা রাজদুহিতা, ততক্ষণ পর্যন্তই রাজা তাকে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু যখন রাজ-দুহিতার পরিচয় তিনি পেলেন তখনই মালবিকার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে আর কোন বাধা রইল না। মধ্যযুগীয় রাজন্যের সামন্তবাদ-বিধৃত সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে ভোগের প্রাধান্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। রাজকন্যা ভিন্ন, রাজা কোন সামান্য তরুণীকে বিবাহ করতে পারে না, পারে শুধু ভোগ করতে। —'শ্রেণীচেতনা তাদের প্রবল। রাজদুহিতা বা অভিজাত বংশের নয় বলেই তৎকালীন সমাজে নারী, মনুষ্যত্বের মর্যাদালাভে বঞ্চিত ছিল।' রাজার প্রেমে মৌলিক সম্ভোগ আছে, আর আছে প্রেমের একটা অভিনয়। রানী হয়ে সেই রমণী রাজৈশ্বর্য ভোগ করছে, এটাই তার প্রথম ও শেষ সান্ত্বনা।—'রাজা মাঝে মধ্যে রানীর শয়নঘরে প্রবেশ করেন, তবে প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে নয় —লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে, এই হচ্ছে রানী হওয়ার পরিণাম। রানী ধারিয়ার মধ্যে এই যন্ত্রণা, এই অসহায়তা, এই বেদনা ফুটে উঠেছে।' মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে সত্যের আলোকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি মহাকবি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কালিদাসের এই নাটকের সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তিন

দেশের ভৌগোলিক-সীমা ও দেশপ্রেমের স্মারকে কবির দুটি রচনা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর আত্মসমীক্ষায় তৃপ্তির স্বাদ, অনাস্বাদিতই রয়ে গেল। তাঁর মনে গণ্ডি অতিক্রমের অভিলাষ জেগে উঠল। দুটি রচনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক নান্দনিক কল্পনার সৃষ্টি হ'ল তাঁর কবিমানসের বাতায়নে। ভারতীয় দুটি মহাকাব্যের আন্তর-নির্যাসকে মন্থন করে কল্পলোকের অত্যুচ্চ-অসীম আকাশপথকে আশ্রয় করে তাঁর যাত্রার মানসিকতা গড়ে উঠল। তাঁর নজরে সুমধুর এই মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে, দেশের ভৌগোলিক-সীমা ও দেশাত্মবোধের উর্দ্ধে, তাঁর যাত্রা শুরু হ'ল—দক্ষিণ থেকে মধ্যভারতে, যেখান থেকে পশ্চিমসীমা ছুঁয়ে উত্তর-পূর্ব কোণ ধরে, তারপর সোজা উত্তরের অভিমুখে। সীমা লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে উত্তরণের যাত্রা, তাঁর উত্তরকালকেও অনন্তকালের জন্য বেঁধে ফেলল।

মালব বা অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী, মালব থেকে বেশি দূর নয়। উজ্জয়িনীতে তখন হয়তো গুপ্তবংশীয় মহারাজ কুমারগুপ্ত রাজ্যশাসন করছেন। আনুমানিক সময় ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কবি কালিদাস তখন কিশোর।

'এরই মধ্যে কবি তাঁর রাজ্য-রাজনীতির প্রাক্তন ও বর্তমান ইতিহাস অবগত হয়েছেন। তিনি জেনেছেন, গুপ্ত রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠার কাহিনী।—সবে শুরু হয়েছে চতুর্থ শতাব্দীর কাল। আনুমানিক ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়। এই বংশেরই এক শক্তিশালী রাজা প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবি বংশের কন্যা কুমারদেবীকে জোর করে তুলে এনেছিলেন, তার বাবা-মায়ের কোল থেকে। শুধু তাই নয় লিচ্ছবি বংশের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি লুঠ করেছিলেন। তারপর চন্দ্রগুপ্ত নাম ধারণ করে বিপুল আধিপত্যে মগধে গুপ্তবংশের রাজকীয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনিই ইতিহাসের 'প্রথম চন্দ্রগুপ্ত'। সেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অন্তরে তাঁর পত্নী কুমারদেবী যতখানি স্থান জুড়ে অবস্থান করেছিলেন, তার থেকেও বেশি সম্মান পেয়েছিলেন রাজকীয়-অর্থনীতির স্মারকে। মহারাজ সরকারি স্বর্ণমুদ্রায় কুমারদেবীর প্রতিমূর্তির সঙ্গে নিজের প্রতিমূর্তিও খোদাই করে দিয়েছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মারা গেলেন ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে। গুপ্তবংশের

রাজা হলেন তাঁরই পুত্র ভারতবিখ্যাত সমুদ্রগুপ্ত। শক্তিশালী-বীর-অত্যাচারী-দিগ্বিজয়ী মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ ৪০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এই সমুদ্রগুপ্ত, মগধ থেকে তাঁর রাজধানী অযোধ্যায় স্থানান্তরিত করেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজবধূ রাণীদত্তা দেবীর গর্ভে যে-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন সেই সন্তানই পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের নাম ধারণ করে নিজেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হিসাবে পরিচয় দিয়ে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত রাজবংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, শকরাজ সত্য সিংহের পুত্র রাজা রুদ্র সিংহকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী পাকাপাকিভাবে অযোধ্যা থেকে উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করেন। শকদের পরাজিত করার মধ্য দিয়ে তিনি হলেন 'শকারি' নামে পরিচিত। আর তাঁর প্রবল বীরত্ব ও বীর্যবত্তার জন্য তিনি নিজের নামের পাশে আরেকটা নতুন উপাধি 'বিক্রমাদিত্য'ও জুড়ে দিলেন। ইনিই ইতিহাসে 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য' নামে সুপরিচিত। এঁর রাজত্বকাল ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে, আনুমানিক ৩০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্ভবত মহাকবির জন্ম হয়েছিল। ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত রাজা হলেন। কুমারগুপ্ত যখন রাজা হন, আনুমানিক তখন তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশ। সুতরাং কুমারগুপ্তের সঙ্গে কালিদাসের বয়সের ব্যবধান আনুমানিকভাবে পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে—অর্থাৎ কবি রাজার থেকে ২৫ থেকে ৩০ বছরের ছোট। কবির 'মেঘদূত' যখন গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের নজরে আসে তখন কবি যুবক এবং রাজা আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ বছরের প্রৌঢ়। মহারাজ কুমারগুপ্ত মেঘদূত পড়ে মুগ্ধ হয়েই কবিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর রাজসভায়। কবি নিশ্চয়ই রাজসভায় আসার সময়ে তাঁর পূর্ব-রচিত 'ঋতুসংহার' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র'—সঙ্গে আনতে ভুল করেন নি। সব ক'টি রচনা পড়ার পর, মহারাজ কুমারগুপ্তের সিদ্ধান্তেই হয়তো, কালিদাস গুপ্ত রাজসভার কবি নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজসভা কবি ও রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠাও স্বাভাবিক ব্যাপার। বয়সের ব্যবধান যা-ই থাক না কেন, কবি-সাহিত্যিকের পরিণত মন, সবার সঙ্গেই ভারসাম্যে পরিচালিত হতে পারে। যা হোক এখন রাজন্য প্রভাববশত কালিদাসের পরিচিতি বাড়তে লাগল। তাহলে মোদ্দা

কথা এই, ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আনুমানিক ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের রাজন্য-সামন্ত ধারাটি কালিদাসের পক্ষে জানা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। সুতরাং মালাবিকাগ্নিমিত্র এবং মেঘদূতের ভূমিকা তথা রসদের মধ্যে তাঁর কালের দর্পণ খুব স্পষ্টভাবেই তাঁর কাব্যাবলীর মধ্যে বাচ্যাতিশায়ী-ব্যঙ্গভাবের আধারে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। রাজা-মহারাজারা অত গভীরে যেতেন না। তাঁদের কাছে কাব্য-সাহিত্যের নিরিখ ছিল বিশ্রাম বিনোদনের সঙ্গী ও বিমূর্ত আনন্দলাভ।

মেঘদূতের ভূমিকার মধ্যে মধ্যে করুণ বিরহ-বেদনা ও প্রিয়া-মিলনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা খুব স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। কবির কি কোন নায়িকা ছিল? সেই নায়িকার কাছ থেকে তিনি কি কোন কারণে বিযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন? হয়তো সেই ঘটনাই ঘটেছিল। কিন্তু এই বিরহযন্ত্রণাই তো মেঘদূতের শেষ কথা নয়। অতি ছোট্ট কথায় নীরেন রায় যা বলেছেন, সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় —'বিরহী যক্ষের সুদীর্ঘ বিলাপ প্রিয়া-বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ততটা নয়, যতটা স্বাধিকারপ্রমত্ত সামান্য অনবধানের ত্রুটিতে, সুখের স্বর্গ অলকা থেকে নির্বাসনের জন্য প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ।'

রাজন্যযুগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ পদদলিত হ'ত। রাজশক্তিই ছিল সমস্ত মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের নিয়ামক-শক্তি। মধ্যযুগের সেই নিষ্ঠুর বর্বরতার কথা কালিদাস ভুলতে পারেন নি। তাই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি নিপীড়িত জনগণের বেদনাকে মেঘদূতের যক্ষের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে রাজন্যবর্গের সমাজচিন্তার আলোকে এখানে কমলকুমার সান্যাল মহাশয়ের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে, —'কালিদাসের কাল ছিল রোমান্সের কাল। রোমান্সের সঙ্গে সামন্তরাজদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সামন্তরাজারা রোমান্স পড়ে আনন্দ পেতেন। কালিদাস সেই রোমান্স যুগের কবি। তাই কখনো কখনো ভাবের আতিশয্যে কাল্পনিকতার জাল বুনে শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেছেন। সংসার-সীমানার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেছেন। এর কারণও বিদ্যমান। এই ঊর্ধ্বচারিতার এবং কাল্পনিকতার কারণ, তৎকালীন সমাজ। কবিরা অনেকসময় সমকালীন সমাজের রূপ দর্শন করে হন অতৃপ্ত। সেই সমাজ তাঁদের তৃপ্তিদান করতে পারে না। তাই তাঁদের কবি-মানস সুদূরের পিয়াসী হয়ে ওঠে। সুদূরের প্রতি

এই পিয়াসা রোমান্টিক ধর্ম।...যখন কবি তাঁর আপন উদ্দেশ্যে এবং সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে অক্ষম তখনই আসে ওই কলাকৈবল্যবাদ।'

তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থায় লঘু পাপে গুরুদণ্ডের এক অসাধারণ নজির মেঘদূত কাব্য। যক্ষ সম্পূর্ণ পরাধীন। রাজকীয় কর্তব্য-কর্মে অবহেলা নিশ্চয়ই অপরাধ। কিন্তু কর্তব্যকর্মের মধ্যে থেকে সামান্য অনবধান হেতু নতুন গড়ে-ওঠা যক্ষপ্রিয়ার প্রেমকে একটু স্মরণ করার দায়ে সাময়িক কর্তব্যভ্রষ্টতা কি দীর্ঘ এক বছরের নির্বাসনের শাস্তিতে বিচারিত হতে পারে ? এখানেই কালিদাসের সোচ্চার প্রতিবাদ রূপকের মধ্য দিয়ে স্বাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গর্জে উঠেছে মেঘদূতের মধ্য দিয়ে এক মধুর সুরের আবহে। কারণ, রাজারা বহুবল্লভ। কিন্তু যক্ষ একমুখী প্রেমের আধারে সাধক-প্রেমিক। তাই নর-নারীর প্রতি ঐকান্তিক প্রেমকেও সেই রাজন্যপ্রভুরা সুনজরে দেখতেন না। তাই প্রেমিক যক্ষ, বহুবল্লভ রাজার হাতে শাস্তি পেলেন। এছাড়া নাগরিক আদিম পাপ, বেশ্যাবৃত্তির চিত্রটিও এই কাব্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে। কবির কালকে রোমান্সের আবরণ দিয়ে সত্যমর্মে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষাটিই মেঘদূতের অন্যতম সামাজিক ভূমিকা।

মালবিকাগ্নিমিত্রে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-মিলন এবং মেঘদূতের মধ্যে প্রিয়া-বিরহের সুতীব্র যন্ত্রণা দেখিয়েও কবি কিন্তু তৃপ্তি পেলেন না। স্পষ্ট করে তিনি আবার কিছু বলতেও পারছেন না, কারণ, তিনি এখন মহারাজ কুমারগুপ্তের রাজসভা-কবি। রাজসভার কবির অনেক দায়-বদ্ধতা থাকে। কিন্তু যাঁর মধ্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির বীজ একবার বপন হয়ে যায় তিনি তো আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তাই কবির অনু-সন্ধান চলে বৈদিক সাহিত্যের পরিমণ্ডলে, ঔপনিষদিক উপাখ্যানে, আর পুরাণের আখ্যানভাগে। তিনি পেয়ে যান তাঁর নূতন সৃষ্টির উপাদান। ঋক্‌বেদের 'সংবাদ-সুক্ত' (১০/৯৫) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে পুরূরবা-উর্বশীর দিব্য-কাহিনীর মধ্য থেকে তিনি সংগ্রহ করেন তাঁর পরবর্তী নাটক 'বিক্রমোর্বশীয়'-র জন্য তথ্য।

পরবর্তীকালে শতপথ ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে কিছু কাব্য, হরিবংশ, অগ্নিপুরাণ, দেবীভাগবত, পদ্মপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ু-

পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য আরও কিছু গ্রন্থে পুরূরবা-উর্বশীর প্রেম-কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। সোমদেব ভট্ট বিরচিত 'কথাসরিৎসাগর'-এও পুরূরবা-উর্বশী যুক্ত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থিক-উৎস হিসাবে কালিদাস মূলত ঋক্‌বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের পুরূরবা-উর্বশীকেই সুসংস্কৃত করে তাঁর নাটকের নায়ক-নায়িকার আসনে বসিয়েছেন।

কালিদাসের নায়ক বিক্রমোর্বশীয় নামের তাৎপর্য, বিক্রমের দ্বারা অর্জিত উর্বশীর আখ্যান যে নাটকে বর্ণিত। কালিদাসের নাটকের উর্বশী, ঋক্‌বেদ-সংবাদ-সূক্তের উর্বশী নন। বৈদিক উর্বশী উদ্ধত, নিষ্ঠুর ও আত্মসচেতন। কালিদাসের উর্বশী প্রেমের প্রতিমূর্তি। প্রেমের জন্য তিনি স্বর্গীয় সম্পদ তুচ্ছ করে নেমে আসতে পারেন মর্ত্যলোকের মহারাজ পুরূরবার কাছে। উর্বশীর থেকেও মহারাজের কৌলীন্য এই নাটকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত। কারণ কালিদাস যে এখন রাজসভার কবি। পুরূরবা-উর্বশীর অসাধারণ প্রেম দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে পাটরানী ঔশীনরীর প্রতি রাজার যে অবিচার সেটিও দেখাতে কবি ভুলে যান নি। মহারাজ কুমারগুপ্তের ব্যক্তিগত জীবনে রাজ অন্তঃপুর এইভাবে কোন পাটরানীর বেদনার্ত অশ্রু কবির কি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল? তা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু ঋক্‌বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে যা নেই, কালিদাসের নাটকে কিন্তু সেটি আছে—মহারানী ঔশীনরী যোগ্য-মর্যাদা না পেয়ে চরম উপেক্ষিতা সত্ত্বেও পতি অন্তঃপ্রাণস্বরূপ হয়ে সবার চোখের অন্তরালে নিজের চোখের জল ঝরিয়েছেন অবিরত। তাহলে মহারাজ পুরূরবার প্রেম তো নর-নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের আবরণ মাত্র! রাজার প্রেম কতো ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর হতে পারে, যখন দেখা যায় উর্বশীর গর্ভজাত পুত্র 'আয়ু'-কে অতি গোপনে চ্যবন মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রেখে পুরূরবা স্বেচ্ছায় উর্বশীর সঙ্গে কামকলায় লিপ্ত হয়ে রইলেন। স্বৈরিণী-বারবণিতা উর্বশী তো নারী! নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ও অহঙ্কার যে মাতৃত্ব—সেটাও তো নিজের গর্ভজাত পুত্রের প্রতি স্নেহবিগলিত ধারায় বর্ষিত হ'ল না? উর্বশী যদি নষ্টা-চরিত্র রমণী হন, তাহলে 'আয়ু' তো পুরূরবারও পুত্র! যে পুরূরবা নিজের ধর্মপত্নী ঔশীনরীর গর্ভসঞ্চার করতে পারেন নি বা করেন নি, সেই পুরূরবার যখন রক্ষিতার গর্ভে পুত্র-সন্তান হ'ল তাকে তো অন্তত পিতৃস্নেহে বা প্রজা-প্রেমেও পালন করা উচিত ছিল। কামকূট রাজার কি নিষ্ঠুর চরিত্র

তুলে ধরলেন মহাকবি। যখন তিনি স্বয়ং ভারতের মহারাজের রাজসভায় সভাকবি হয়ে বসে আছেন।

কবি তাঁর কালের বৈশিষ্ট্যটিই বিক্রমোর্বশীয় নাটকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-ভূমিকার আস্তরণে গেঁথে দিলেন। যেখানে শুধু—'ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং স্থির যৌবন উপভোগের বাসনা, স্ত্রী থাকলেও রাজার অন্য সুন্দরী রমণীর প্রতি আসক্তি, সুন্দরী নারীতে পুরুষের সন্তানোৎপাদন কামনা, স্বৈরিণী রমণীর দেহ-সর্বস্বতা—এগুলিই বিক্রমোর্বশীয় নাটকের শেষ কথা।'

চার

মর্ত্যের মহারাজ বিক্রমের কাছে স্বর্গের স্বৈরিণী সুন্দরী উর্বশী এসে প্রেমপাগল হওয়ায় অভিজ্ঞ ভারতসম্রাট কুমারগুপ্ত সুখী হলেও কবি কিন্তু সুখী হতে পারলেন না। বিক্রম (পুরূরবা) ও উর্বশীর প্রেমের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ থাকলেও, সেই প্রেমও যেন কবির কাছে দেহসর্বস্ব কামের মতো মনে হ'ল। তাই কবিকে এক অসহনীয় অতৃপ্তি পেয়ে বসে। এদিকে বেশি বয়সে মহারাজ কুমারগুপ্তের একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রের জন্ম হয়েছে। মহারাজের পুত্রলাভ—সে এক বিশাল রাজকীয় সমারোহ চলছে রাজ্যের সর্বত্র। সকলের ব্যস্ততায় মুখরিত উজ্জয়িনী নগরীতে উৎসবের রমরমা অনুষ্ঠান। মহারাজের পক্ষ থেকে আহ্বান এলো মহাকবির কাছে। মহাকবি জানালেন, রাজপুত্রের শুভজন্মের স্মারক হিসাবে আমি একটি মহাকাব্য উপহার দেবো দেশকে। রাজা নিরতিশয় আনন্দিত হয়ে কবিকে প্রচুর উপঢৌকন দিলেন। রাজা জানালেন—গুপ্ত রাজবংশের কুলদেবতা কার্ত্তিকের নামে, আমার পুত্রের নামকরণ হবে স্কন্দগুপ্ত। কবিও রাজধানীর কলকোলাহল থেকে অনেক দূরে, হিমালয়ের নির্জন পরিবেশে অবস্থান করে শুরু করলেন তাঁর অপূর্ব সুন্দর কাব্য—'কুমারসম্ভব'।

মহারাজ কুমারগুপ্তের কুমার (পুত্র) সম্ভব (জন্ম) হয়েছে। কিন্তু কবি তো দেশ-কাল পাত্রের ঊর্ধ্বে, তাঁর কাব্যকল্পনাসুন্দরীকে পৌঁছে দিয়েছেন অনেক আগেই। তাই 'কুমারসম্ভব' শুধু তো স্কন্দগুপ্তের জন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এ কাব্য যে যুগান্তরের যাত্রায় অব্যা-

হত এক দলিল। একে তো হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্ববিদ্যার পরিমণ্ডলে নজির করে রাখতে হবে। তাই প্রয়োজন রূপকের মোড়ক, ঐতিহাসিক তথ্যের বাতাবরণ ও কাব্যের উপাদানে, সহমত-জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। এতকাল তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে সুখ ছিল কিন্তু আনন্দ ছিল না, দেহসর্বস্ব কামের আকর্ষণ ছিল, কিন্তু দেহাতীত প্রেমের উত্তরণ ছিল না। প্রেম বা কাম কোনোটাই ধর্মের দ্বারা পরিশোধিত হয়ে ওঠে নি। এ ধর্ম কোন ধর্ম? পূজা-মন্ত্র-মন্দির-বিগ্রহ-শাস্ত্র-সংহিতা-মানসিক ও সংকল্প—এই সবই কি? না—এসব কিছুই নয়। এ ধর্ম, কবিধর্ম। ক্রান্তদর্শিতার ধর্ম। প্রেমের কাছে কামের পরাজয় এবং নর-নারীর প্রণয় সম্পর্কে পরিণত-উপলব্ধির ধর্ম। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। '···He atones for devoting long years of youth in the female sex by reducing KAMA the embodiment of passions into ashes. Henceforth his love is an absolutely divine sentiment and no passion.' এই কামগন্ধশূন্য প্রণয় প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশাই আরেক জায়গায় বলছেন—'আমরা আজ কালিদাসের একটি প্রণয়ের অদ্ভুত চিত্র দেখাইব। আমাদের কবিরা যে, প্রণয়ের বর্ণনায় কত উচ্চে উঠিতে পারিতেন তাহা দেখান এ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ···আমরা আজ যেকথা বলিতেছি তাহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের প্রণয় বোধহয়, ঋষিরাও কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি না? অন্য কবিদের তো কথাই নাই।···সে প্রণয় পার্বতীর প্রণয়, শিবের প্রতি। সে প্রণয় দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া যায়। সেই প্রণয়।'

বিভিন্ন পুরাণ থেকে সংগৃহীত কুমারসম্ভবের মূল কাহিনী হ'ল,—প্রবল পরাক্রান্ত তারকাসুর ব্রহ্মার বলে প্রবল উদ্ধত হয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গ অধিকার করে নিয়েছিল। বিপন্ন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে পুনরায় স্বর্গাধিকারের প্রস্তাব দিলে ব্রহ্মা তাঁদের পরামর্শ দেন, দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়-দুহিতা উমার বিবাহ এবং তাঁদের মিলনে যে পুত্রোৎপাদন হবে, সেই পুত্রই দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণ করে, অসুরকে পরাজিত করবে এবং স্বর্গরাজ্য পুনরায় দেবতাদের অধিকারে ফিরে আসবে। মহাদেব যেহেতু যোগীপুরুষ, সেইজন্য মদন-রতি-বসন্তের সহযোগিতায় অকাল বসন্তের উন্মেষ ঘটিয়ে শিবের সঙ্গে

পার্বতী বা উমার প্রেম-মিলনের প্রস্তুতি করতে হবে। এই পূর্বপরিকল্পনামাফিক মহাদেব ও উমার বিবাহ হয় এবং পরবর্তীকালে অমর-যুগলের পুত্ররূপে কার্তিক বা কুমারের সম্ভব হয়। পুরাণের এই কাহিনীকে শাশ্বত-সৌন্দর্যের একটা আবরণ দেওয়ার জন্য কবি এই কাব্যে শিবের দ্বারা মদনভস্মের সূচনা এবং বিশ্বকল্যাণের স্বার্থে পুনর্জীবনদানের মধ্য দিয়ে প্রেম-সংস্কৃতির পরিবেশের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

পৌরাণিক এই ভূমিকার অন্তরালে রাজসভার কবি কালিদাসের আরও একটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের সাদৃশ্যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে শক ও হুন— এই অনার্য জাতির যুদ্ধবিষয়ক একটা পরিলেখের অবকাশ আছে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বহুদিন ধরেই স্বীয় শক্তিবলে উজ্জয়িনীতে শকরাজ সত্যসিংহ ও তার পুত্র রাজা রুদ্রসিংহ রাজত্ব করে আসছিলেন। পাটলিপুত্র, অযোধ্যা প্রভৃতি রমণীয় রাজধানীগুলি থেকেও উজ্জয়িনীর নাগরিকতা তথা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক বেশি পরিমাণে রমণীয় ছিল। সুতরাং রাজধানীর ভৌগোলিক সীমাকে সুবিস্তৃত করার জন্য শক-অভিযান ও 'শকারি' (শক+অরি) হওয়া, রাজার রাজ্যলাভের এক স্বাভাবিক সূত্র। শিব অনেক পরবর্তীকালে 'আর্য' দেবতা বা বৈদিক দেবতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পূর্বে শিব ছিলেন অনার্য দেবতারূপে পরিচিত। এখন শক রাজ্যের কোন বিচক্ষণ ও শক্তিমান প্রতিনিধিকে কোন সুন্দরী আর্য-রমণীর সঙ্গে প্রেমলীলা-লাম্পট্যের সুযোগ দিয়ে, উক্ত রাজ্যের প্রতিরক্ষা বিভাগকে হস্তগত করা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পক্ষে খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয় বলেই মনে হয়। এ অন্তর্ঘাতমূলক রাজনীতির শিকার শকরাজ রুদ্রসিংহ। ঐতিহাসিকের প্রতিবেদনে আমরা জানতে পারি, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ভককত-রাজ্য তথা ক্ষত্রপদের (অনার্য রাজা) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তাঁর কন্যার সঙ্গে ভককত রাজ্যের রাজপুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন।

শিব-পার্বতী রূপকের মধ্যেও, পার্বতীর কামোত্তীর্ণ প্রেম, সহজ স্বভাবের বিরুদ্ধেই যেন প্রধাবিত হয়েছে। পার্বতী স্বেচ্ছায় শিবসঙ্গে বিমোহিত হন নি। এরই নাম রাজনৈতিক চক্রান্ত, যেটি রাজতন্ত্রের এক মহান অবদান। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্ভাব্য এই ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁর পুত্র-পৌত্রাদিক্রমেও ঘটে থাকতে পারে। এইসব সম্ভাব্য ঘটনাবলীর

নীরব সাক্ষী মহাকবি কালিদাস, পুরাণের অতিপ্রাকৃত মোড়কে, বাস্তবকে অব্যক্ত ভাবনায় কাব্যের শ্লোকে শ্লোকে প্রকাশ করে সামাজিক সত্যের মর্মকথাটিকেই ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কুমারগুপ্ত সুখী হয়েছিলেন তাঁর পুত্রলাভের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মহাকাব্যকে লাভ করে। জনগণ সুখী হয়েছিলেন দৈব-নায়ক-নায়িকার নিষ্কাম প্রেমের একটি অনবদ্য কাব্য পেয়ে, আর কবি সুখী হয়েছিলেন ইতিহাসের সত্য ঘটনাকে বর্ণালী-বর্ণমালার আবরণে প্রকাশ করে।

ধীরে ধীরে বছর গড়িয়ে সময় এসে দাঁড়াল ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। মহারাজ কুমারগুপ্ত প্রয়াত হলেন। উজ্জয়িনীর গুপ্ত রাজবংশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন মহারাজ স্কন্দগুপ্ত। ইনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করেই নিজেকে 'স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য' নামে ঘোষণা করলেন। মহাকবি এখন সারা-ভারতের অবিসংবাদিত এক প্রতিভা। রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি। গুণী মানুষরা এখন কবিকে 'বিক্রমসভ্য' বলে অভিহিত করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সভ্যতাই বিক্রমসভ্য। কবির আনুমানিক বয়স এখন সম্ভবত পঞ্চাশোর্ধ্ব।

দিব্য-নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলন বর্ণনা করেও কবির আশা মিটল না। মানুষের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, প্রেম-বিরহ, মহিমা-দৈন্য, শাসন-শোষণ এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণের ব্রতকে কীভাবে রাজতন্ত্রের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে মুক্ত করা যায় তারই আত্মিক-অনুশীলনের কাব্যসৃষ্টিতে কবি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। মহাভারতে আদিপর্বে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কাহিনীকে অবলম্বন করে তিনি রচনা করলেন তাঁর তৃতীয় বা শেষ নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।' পূর্ববর্তী দুটি নাটকের নামকরণে নায়ক-নায়িকা (বিক্রম-উর্বশী/মালবিকা অগ্নিমিত্র) একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তৃতীয় বা শেষ পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর শকুন্তলা-নাটকে, শুধু নায়িকার নাম দিয়েই নামকরণ করলেন। এই নাটকে ভারতসম্রাট দুষ্মন্ত নায়ক হলেও, আশ্রমবালিকা শকুন্তলার প্রতি কবির প্রভূত পক্ষ-পাতিত্বে এটি নায়িকা-প্রধান নাটক হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে গেছে।

মহাভারতের শকুন্তলা গভীর অরণ্যের শবরীর মতো ভয়মিশ্রিত সৌন্দর্যের আধার। আর কালিদাসের শকুন্তলা সাজানো বাগানের হাস্য-ময়ী মালিনী। মহাভারতে প্রিয়ংবদা-অনসূয়ার মতো লাবণ্য-ললিত সখীর কোন চিহ্ন নেই। কালিদাসের নায়িকা, সখি-সঙ্গিনী হয়ে আশ্রমের

লতাবিতানের মতো সরসকোমল তনুতে,মহারাজের সঙ্গে নায়িকার প্রেম ও পরিণয়েও পিছপা হয় নি। মহাভারতের দুষ্মন্ত চরিত্রহীন, লম্পট। কালিদাস 'দুর্বাশার-শাপ' এনে মহারাজের চরিত্রকে সুসংহত ও ন্যায়নিষ্ঠ করে তুলেছেন। তাই কালিদাসের শকুন্তলা, উৎস থেকে প্রবাহের উৎসবে অনেক সৌন্দর্যমুখর। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক—শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা-কালীন বর্ণনা কবিকল্পনার এক সার্থক নজির। সমগ্র চতুর্থ অঙ্কটিই কালিদাসের মৌলিক কবি-কল্পনার পরিচয় বহন করে। মানব-মন ও প্রকৃতির এরূপ সম্পর্ক নির্ণয়, বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। সেইজন্যই সাহিত্যের সমালোচকরা বলেন—

'কালিদাসস্য সর্বস্বং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থাঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥'

কোনকোন গবেষকের মতে কবি 'পদ্মপুরাণ' থেকে অভিজ্ঞানশকুন্তলমের রসদ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর প্রমাণিত হয়েছে যে, পদ্মপুরাণ এই নাটকের উৎস নয়। আবার কারুর মতে, রামায়ণ-কাহিনীই, শকুন্তলার উপজীব্য ভূমিকা। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বজ্জনই জানিয়েছেন, শকুন্তলা নাটকের গ্রান্থিক-উৎস, মহাভারতের আদিপর্ব।

কবির এই নাটকে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর একটি আন্তর-মর্মার্থ আছে। 'অভি' শব্দের অর্থ—সর্বতোভাবে বা সম্পূর্ণরূপে। আর 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ—জানা। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জানার নাম—'অভিজ্ঞান'। শকুন্তলাকে সম্পূর্ণরূপে জানাই—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। এই নাটক অভি-নীত হচ্ছে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায়—যে-সভায় অনেক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত। সুতরাং সামান্য একটু ইঙ্গিতেই, বিশেষজ্ঞদের পক্ষে এই নাটক হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ব্যাপার নয়। মহাভারতে কণ্বমুনি বলে-ছিলেন—'নির্জন বনের মধ্যে পাখির পাখার তলায় লালিত এই কন্যাকে আমি পেয়েছিলাম। এর জন্য আমি এই কন্যার নাম দিয়েছিলাম—শকুন্তলা।' মহাভারতের পাতায় শকুন্তলার এই পরিচয়ের মধ্যে একটা বিপুল জিজ্ঞাসা থেকে যায়। শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রেম-পরিণয় হলেও, মহাভারতের কাল থেকে কালিদাসের কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শকুন্তলা প্রকৃতপক্ষে তমসাচ্ছন্ন-ইতিবৃত্তের গুহায় অজ্ঞাত এক নারীসত্তা। সেই অপরিচিতা নায়িকাকে, মহাকবি 'অভিজ্ঞান' শব্দের

দ্বারা যুক্ত করে সকল সামাজিক-জ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ দর্শকদের এই অপরিচিতার স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্য মঞ্চের ওপর তুলে ধরলেন। মহারাজ স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজসভার মহাকবির গর্বে গর্বিত হয়ে আনন্দ অনুভব করলেন।

শকুন্তলা নাটকের শুরুর মধ্যে একটা অপূর্ব সামাজিক চমক আছে। মহারাজ দুষ্মন্তের মৃগয়া-যাত্রায় এক প্রবল বেগসম্পন্ন হরিণের পশ্চাদ্ধাবন, রাজতন্ত্রের প্রজাপীড়নের এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। কালিদাসের সমাজ যেহেতু রাজণ্য-ব্রাহ্মণ্যের পবিত্র-মোর্চায় (?) সুসংবদ্ধ ছিল, তাই কণ্বমুণির আশ্রমের কাছে এসে হরিণের অনুসরণ, সামাজিক-বিধানের বাঁধে বাতিল করতে হয়েছিল। রাজসভার কবি, রাজসভাতেই নাটক মঞ্চস্থের অবকাশে রাজার চরিত্রের ইঙ্গিতটি অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করে মহাকবিত্বের মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, কবি 'শকুন্তলাকে সম্পূর্ণভাবে জানা'—অর্থে এখানে তৎকালীন সমাজের সকল নারীর বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে জানা'-র ইঙ্গিতটিই সুকৌশলে এই নাটকের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করতে চেয়েছেন।

সরল আশ্রমকন্যা শকুন্তলার প্রথম যুবক পুরুষ দর্শনের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-চাপল্যের উন্মেষ ঘটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মহারাজ দুষ্মন্ত নারী-ব্যবহারে পুরানো পাপী। প্রথম শকুন্তলা দর্শনে তাঁর লোলুপদৃষ্টি কামাসক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু প্রেম জাগতে পারে না। কারণ, রাজা বহুবল্লভ। একমুখী প্রেমের মগ্নতা তাঁর কাছে আশা করা যায় না। সরল গ্রাম্য বালিকাকে দেখে রাজা বিহ্বল হয়ে শকুন্তলার সখিদের সাহায্যে গান্ধর্বমতে সেই বালিকার পাণিগ্রহণ করে তাকে গর্ভবতী করে দেন। তারপর ভোগের মাশুল হিসাবে কিছু উপঢৌকন দিয়ে রাজতন্ত্রের নায়ক যেভাবে কাজ সারে ঠিক সেইভাবেই একটি আংটি দিয়ে মহারাজ দুষ্মন্ত আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যান। কণ্বমুণি পরবর্তীকালে সব ব্যাপার জেনেশুনে গর্ভবতী পালিতা কন্যাকে পতিগৃহে যাত্রা করান। তার আগে দুর্বাশার শাপে শকুন্তলা বিস্মরণের শরিক হয়। এ-বিস্মরণ শকুন্তলার নয়, শকুন্তলা যাঁর সুখস্মৃতিতে বিমুগ্ধ তাঁর বিস্মরণ। এখানেই রাজসভার কবি রাজাকে সকল পাপের আধার থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে সার্থক হলেন। এরই ফলশ্রুতি রাজসভায় শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান। —'দুষ্মন্তের মধ্যে এই একনিষ্ঠতার অভাব

বহুবল্লভতার প্রকাশ এবং একনিষ্ঠতার সঙ্গে বহুবল্লভতার দ্বন্দ্বই কালিদাস দেখিয়েছেন।' সেই যুগে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে একনিষ্ঠতার চরমতম অভাবটিই দেখানো এই নাটকের একটি উদ্দেশ্য।

শকুন্তলার পুত্র জন্মানোর পর তার সমগ্র হৃদয় জুড়ে ছিল শুধু একটিমাত্র পরিচয়। সেই পরিচয় জননীর। কাশ্যপের আশ্রমে স্বামী-পরিত্যক্তা শকুন্তলা তবু স্বামীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিল। এ শুধু শকুন্তলার ভবিষ্যৎ-চিন্তার সামগ্রী। মহারাজদের এটাই ছিল নারীর প্রতি ব্যবহারের নমুনা। কবি এই নাটকে একাধারে যেমন রাজতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত করেছেন, আবার রাজাকে তুষ্ট রাখার জন্য যা-যা করণীয় তাও করেছেন। এতৎসত্ত্বেও গুপ্ত রাজবংশের রাজারা কি কবির উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারেন নি? এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক কমলকুমার সান্যালের উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও যথার্থ—'···ভলটেয়ারের নাটকে কৃষকদের ওপর অত্যাচার দেখে সামন্ত এবং অভিজাত শ্রেণী আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠতেন। আর ভলটেয়ার পেছনে দাঁড়িয়ে বলতেন —They are fool! কালিদাসও এমন সুন্দরভাবে তাঁর মূল বক্তব্য-বিষয়কে উপস্থাপিত করেছেন, যার গভীরে পৌঁছবার ক্ষমতা রাজাদের ছিল না। বরং নারীদের ভোগ করা যে রাজধর্ম, কবির নাটকে তার প্রতিফলন দেখে রাজারা আনন্দিত হতেন। এই হচ্ছে তাঁদের মনস্তত্ত্ব। ···মনে হয় কালিদাস প্রেমকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে একদিকে প্রেমের মহৎ সম্ভাবনাকে যথাস্থানে স্থাপন করতে প্রয়াসী ছিলেন। অপরদিকে রাজা-মহারাজার নিষ্ঠুরতা এবং ভণ্ডামিকে পরোক্ষে তীব্র কটাক্ষ করেছেন।'

যে-কোন কারণেই হোক, মনে হয় কালিদাস শকুন্তলা নাটকটি প্রায় সম্পূর্ণ করেও সমাপ্ত করেন নি। সমাপ্ত করার আগেই তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'রঘুবংশ' প্রণয়নে হাত লাগান। এবং রঘুবংশের শেষের দিকে এসে আবার শকুন্তলায় ফিরে গিয়ে সেটি সমাপ্ত করেন। এবং পুনরায়, সমাপ্তপ্রায় রঘুবংশের কাজে হাত দেন। এবার আমরা রঘুবংশের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে রঘুবংশ ও শকুন্তলার নির্মাণ সমসাময়িকতার সূক্ষ্ম সূত্রটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

পাঁচ

কালিদাসের কবি-জীবনের শেষ রচনা 'রঘুবংশ'। এই কাব্যে কবির পরিণত মনের যাবতীয় বিষয়াবলী প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘ উনিশটি সর্গে এবং ১৫৬৯টি শ্লোকে গ্রথিত এই কাব্যের সুদীর্ঘ পটভূমিকায় স্বর্গ-মর্ত, নাগলোক, সমুদ্র, পর্বত, বন, নদ-নদী, সমগ্র ভারত তথা বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশ, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ইতিহাস— সর্বোপরি আলঙ্কারিক বিচিত্র রসের রসায়নে পরিব্যাপ্ত এই কাব্যটিও, কাব্যের গণ্ডি অতিক্রম করে মহাকাব্যে পর্যবসিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা তাঁদের গ্রন্থসমূহে যা-যা ভালো ও উৎকৃষ্ট বস্তু বর্ণনা করেছেন, কালিদাস সেই সবগুলিই বেছে বেছে রঘুবংশের মধ্যে সুসংহত করে, এই কাব্যকে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয় সুসমৃদ্ধ কাব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই কাব্যে উনত্রিশ পুরুষের এক আলেখ্য-প্রতিম বর্ণনা আছে। এই দীর্ঘায়ত কাব্যের কোথাও বর্ণনার বিবরণে পুনরুক্তি-দোষ দেখা দেয় নি, একঘেয়ে ভাবনার অবকাশ নেই কোথাও। সর্বাঙ্গসুন্দর ত্রুটিমুক্ত কাব্যের প্রত্যেকটি লক্ষণই এই কাব্যের মধ্যে স্বকীয় প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল। বলা বাহুল্য, কালিদাসের মতো বিশ্ববরেণ্য কবি, তার ওপর আবার পরিণত প্রতিভার এই সৃষ্টি— নিঃসন্দেহেই কাব্য-সাহিত্যের অনবদ্যতায় অক্ষয় সম্পদ হিসাবেই পরিগণিত ও পরিচিত হবে।

এই কাব্যের মূল গ্রন্থিক-ভূমিকা, আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ। 'রঘুবংশ'— এই কথাটিও রামায়ণে পাওয়া যায়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে, তৃতীয় সর্গের নবম শ্লোকে আছে— 'রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভাগবান্ মুনিঃ'—(আদি—৩/৯)। রঘুবংশ কাব্যের যে মূল পাঁচ রাজ-নায়ক —দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রামচন্দ্র— এঁদের বিবরণ লিখতে গিয়ে কালিদাস দীর্ঘ ষোলটি সর্গের অবতারণা করেছেন। অবশিষ্ট তিনটি সর্গে চব্বিশজন নৃপতি বর্ণিত হয়েছেন। এর কারণ কি ? প্রথম পাঁচজন রাজ-নায়কের মধ্যে মূলত তিনজন, অর্থাৎ দিলীপ, রঘু ও অজ— এঁদের সম্বন্ধে রামায়ণে সুবিস্তৃত কোন ইতিবৃত্ত নেই, পরিলেখ আছে মাত্র। দশরথ সম্বন্ধে রামায়ণে মোটামুটি একটা বিস্তার করা হয়েছে। আর রামচন্দ্র তো রামায়ণের মূল নায়ক। 'রামায়ণ' কথার অর্থের সঙ্গেও এর সার্থক সঙ্গতি রয়েছে। রামের অয়ন বা যাত্রাপথ— রামায়ণ। সুতরাং রামায়ণে যে তিনজন রাজ-নায়ক, অর্থাৎ দিলীপ-রঘু-অজ পরিলেখের ইতিবৃত্তে

যেভাবে অল্পকথায় বর্ণিত হয়েছেন, তাঁদের নিয়ে কালিদাস যে সর্গের পর সর্গ লিখে গেলেন—এর উৎস তিনি কোথায় পেলেন ? রঘুবংশের সূচনা দুটিতে মহারাজ দিলীপের কথা বলা হয়েছে। দিলীপের সুযোগ্য পুত্র রঘু-ই কবির রঘুবংশের প্রথম ও প্রধান নায়ক। তাহলে যখন রঘু-বংশের সৃষ্টিই হয় নি, তখন রাজা দিলীপ সম্পর্কে অতগুলি শ্লোকে রঘু-বংশীয়-নৃপতি হিসাবে কালিদাসের বর্ণনা করার উদ্দেশ্যটা কি ? রঘু থেকে তো 'রঘুবংশ'-এর সূচনা ! এর পর সতেরো সর্গ থেকে উনিশ সর্গ পর্যন্ত উক্ত তিনটি সর্গে কবি যে চব্বিশজন রঘুবংশীয় রাজাদের নিয়ে এলেন এঁদের কথা রামায়ণেও নেই। তাহলে কবি এই চব্বিশজন রাজাকে পেলেন কোত্থেকে ? এটা স্পষ্ট যে, রঘুবংশের প্রান্তিক-ভূমিকায় রামায়ণের ঋণ যৎসামান্য। মূলত রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষদের বিষয়ে কবি যা লিখেছেন, সেটা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। কিছু সাহায্য তিনি নিয়েছেন বিভিন্ন পুরাণ থেকে। যে যে পুরাণে রামচন্দ্রের যে যে উত্তরপুরুষদের নাম আছে সেগুলির খতিয়ান নিম্নরূপ :

(১) বিষ্ণুপুরাণ : হিরণ্যনাভ, পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র ও মরু।

(২) ভাগবতপুরাণ : হিরণ্যনাভ, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র ও মরু।

(৩) হরিবংশ : শঙ্খ, ব্যুষিতাশ্ব, পুষ্প, বিদ্বান, অর্থসিদ্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র ও মরু।

(৪) গরুড়পুরাণ : হিরণ্যনাভ, পুষ্পক, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র ও মরু।

(৫) কল্কিপুরাণ : পুষ্প, ধ্রুব, স্যন্দন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র ও মরু।

(৬) বায়ুপুরাণ : শঙ্খ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, পুষ্প, বিদ্বান, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র ও মরু।

—এবার রঘুবংশের শেষ রাজাদের তালিকাটি এরূপ : কুশ, অতিথি, নিষধ, নল, নভঃ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনগ, পারিযাত্র, শিল, উন্নাভ, বজ্রনাভ, শঙ্খন, ব্রহ্মিষ্ঠ, পুত্র, পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন ও অগ্নিবর্ণ।

রঘুবংশের একুশতম নৃপতি হিরণ্যলাভের নাম বিষ্ণুপুরাণ, ভাগ-বতপুরাণ ও গরুড়পুরাণে দেখা যায়। রঘুবংশের সাতাশতম নৃপতি

ধ্রুবসন্ধি, তাঁর পুত্র সুদর্শন ও সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ—অর্থাৎ ধ্রুবসন্ধি-সুদর্শন-অগ্নিবর্ণ—এই ক্রমটি সব পুরাণেই সমভাবে গৃহীত হয়েছে। ধ্রুবসন্ধির পুত্র যে সুদর্শন, এ-পরিচয় সর্বত্রই স্বীকৃত। একমাত্র কল্কি-পুরাণ, ধ্রুবসন্ধির পুত্র হিসাবে স্যন্দনের নাম উল্লেখ করেছেন। স্যন্দনই যে সুদর্শনের শাব্দিক-পরিপূরক তা বলা বাহুল্য। কালিদাস, অগ্নিবর্ণে বংশ লোপ করে 'রঘুবংশ' সমাপ্ত করেছেন। অন্যান্য সব পুরাণই, অগ্নিবর্ণের পর দু'জন নৃপতির, যথাক্রমে—শীঘ্র ও মরুর নামোল্লেখ করেছেন। মনে হয়, কালিদাসের কালে উক্ত পুরাণগুলিতে শেষোক্ত রাজা দু'জনের নাম বর্তমান ছিল না। কালিদাসের পরবর্তীকালে পুরাণ-গুলিতে শীঘ্র ও মরু প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, পুরাণকার সর্বত্রই মরুকে শেষ রাজা দেখিয়ে সূর্যবংশের লোপ করিয়ে দিয়েছেন। সব পুরাণেই বিশুষ্ক মরুভূমির প্রতীক, মহারাজ মরু নিঃসন্তান রূপে বর্ণিত হয়েছেন। সেই সূত্রেও নিশ্চিন্ত যে, মরুর পরে রামচন্দ্রের আর কোন উত্তরপুরুষ থাকতে পারে না। মরু-তেই সূর্যবংশের সূর্যাস্ত ও রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষেরা নিশ্চিহ্ন। মোটামুটিভাবে এই হ'ল রঘুবংশের প্রান্তিক-ভূমিকা।

প্রথম ষোল সর্গে যে পাঁচজন রাজনায়ক, বিশেষ করে দিলীপ-রঘু-অজ এঁদের কাহিনীর মধ্যে এবং শেষ তিন সর্গের বর্ণনায় যে-নৃপতিরা আলোচিত হয়েছেন—তার মধ্যেই রঘুবংশের আরেকটি অপ্রকাশ্য ভূমিকা নিহিত আছে। আমরা পূর্বে এক জায়গায় বলে এসেছি, কালিদাস ছিলেন বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গভাবের কবি। এই লক্ষণটির মর্মার্থ হ'ল—কবি যা বলেছেন, তার ভেতরেও আরেকটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক বিষয় আছে, যেটি কবি কাব্যের অনুরোধে এবং অতিবাস্তবতার বিষয়টিকে প্রকাশ না করার মানসিকতায় সব সময়েই সচেষ্ট থেকেছেন। রঘুবংশের দিলীপ-রঘু-অজ-এর কাহিনী এবং কুশ, অতিথি থেকে শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের কাহিনী পর্যন্ত বর্ণনানুক্রম পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গভাবটি কত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে কবি এর মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, রামায়ণের মূল নায়ক রামচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষদের সম্পর্কে এত নিখুঁত পর্যালোচনা, ঠিক না-জেনে বা চোখে না-দেখে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করা, কবি-জনোচিত ধর্মের প্রতিকূল তত্ত্ব বলেই মনে হয়। আর কবির পক্ষে রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের দেখা,

সেটাও আদৌ সম্ভব নয়। তাহলে? এখানেই কবির বাচ্যাতিশায়ী আলঙ্কারিক তত্ত্বের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা।

এবার একটু ভারত-ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে। কালিদাসের কাব্যের রাজ-নায়ক রঘু দিগ্বিজয়ের পর 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞ করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পিতা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তও দিগ্বিজয়ের পর 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ করেছিলেন। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। এর আগে গুপ্তবংশের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যে সময়ে দিলীপ মহারাজ, সেই সময়ে রঘুবংশের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও, রঘুর পিতা হিসাবে দিলীপই প্রাক্-রঘুবংশীয় বৃত্তের একটা ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। তারপর রঘুর সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের একটা সামঞ্জস-সেতু রচনা করে কালিদাস ইতিবৃত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে রূপকের ভেতর দিয়ে রঘুর বর্ণনা শুরু করে দিলেন। এইভাবে রঘুর পর অজ, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। অজ-এর পর দশরথ, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত। এবং দশরথের পর রামচন্দ্র, বাস্তবায়িত-রাজনৈতিক ভূমিকায় স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। প্রকৃতপক্ষে স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যই গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট। যেমন রামচন্দ্রই রঘুবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। রামচন্দ্রের পর কুশ থেকে দীর্ঘ সময় ধরে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত—এই চব্বিশজন নৃপতি সকলেই নিতান্ত অপাংক্তেয় বা নামে-মাত্র রাজা। একই ঘটনা আমরা গুপ্তবংশের নিঃশেষের ইতিহাসের পথে দেখতে পাই।

এই প্রসঙ্গে রঘুবংশের প্রথম্ থেকে তৃতীয় সর্গে, প্রতিটি সর্গ থেকে একটি করে শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রথম সর্গের ৫৫ শ্লোক—'তস্মৈ সভ্যাঃ সভার্যায় গোপ্তে, গুপ্ততমোন্দ্রিয়াঃ।' এর আক্ষরিক অর্থ—'সকল ইন্দ্রিয়কে গোপনীয় করে রাখা ঋষিসভ্যের আশ্রমে উপস্থিত মহারাজ দম্পতিকে অভ্যর্থনা করলেন।' দ্বিতীয় সর্গের ২৪ শ্লোক—'অন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণী সহায়ঃ।' এর অর্থ—'গোপ্তা অর্থাৎ রাজা মহারানীর সঙ্গে অতি সাধারণ গৃহিণীর মতো···।' তৃতীয় সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে—'তনুপ্রকাশেন বিচেয় তারকা প্রভাত-কল্পা শশিনের শর্বরী।' এর বাংলা করলে দাঁড়ায়—'সকালে চাঁদ ডুবে গেলে রাত্রির যে অবস্থা হয়, তাঁরও (মহারানীর) সেই অবস্থা হল।' —উপরিউক্ত তিনটি শ্লোকে বাচ্যাতিশায়ী অর্থে 'গুপ্তবংশ' এবং 'চন্দ্র'—এই দুটি শব্দ অতি-

সুন্দরভাবে অপ্রকাশিত মর্মার্থে অভিব্যক্ত হয়েছে। চন্দ্র, গুপ্ত হলেই নিশাবসান হয়—এটি বড় সুন্দর গুপ্তবংশীয় ইতিবৃত্তের নিরিখে রঘুবংশীয় রাজার বর্ণনা বলা যেতে পারে।

কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যই গুপ্তবংশের প্রধান শেষ সম্রাট, একথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। এর মূলে ছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ। হূন ও এফথ্যালাইট উপজাতিসমূহ স্কন্দগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গুপ্তবংশীয় রাজাদের পরাজয়ের নজির নেই বললেই হয়। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত উপরিউক্ত উপজাতিদের দ্বারা প্রাথমিকভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে হূন ও এফথ্যালাইটরা গুপ্তবংশের রাজাদের ওপর চড়াও হয়েছিল। ফলে, গুপ্তবংশের রাজারা ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েন। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তবংশের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। এই রাজা নিঃসন্তান থাকায় তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই পুরগুপ্ত প্রায় ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্তবংশের রাজসিংহাসনে যাঁরা যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নরসিংহগুপ্ত। এই নরসিংহগুপ্তের সময় থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ওপর উক্ত উপজাতিদের আক্রমণ তীব্রতর হয়। তাই ইতিবৃত্তের নথিতে আমরা দেখছি, গুপ্তবংশের প্রথম-দিককার নৃপতিরা বিজয়ীর স্মারকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করতেন। কিন্তু নরসিংহগুপ্ত তাঁর শৌর্যবীর্যের হীনমন্যতায় 'বালাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। 'বিক্রমাদিত্য'—তীব্র তেজসম্পন্ন সূর্য, আর 'বালাদিত্য' নিস্তেজ শিশু-সূর্যের বা প্রভাত-সূর্যের তেজসম্পন্ন এক সত্তা। মহারাজ নরসিংহগুপ্ত নিজেই তাঁর দুর্বলতার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। ইতিহাসের ধারাভাষ্যানুযায়ী এর পরেই অর্থাৎ ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দেই গুপ্তবংশের পতন হয়ে যায়।

রঘুবংশের শেষ নৃপতিদের সঙ্গে গুপ্তবংশের শেষ নৃপতিদের একটি সুন্দর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম মহারাজ কুশের পুত্র অতিথি। রাজা অতিথিকে কালিদাস একটু পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এছাড়া আর সকলেই অপদার্থ সম্রাট। কবি এখানে মহারাজ সুদর্শন সম্পর্কে একটি সুন্দর বাচ্যাতিশায়ী আলোকপাত করেছেন। কবি

বলেছেন—'মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী সিংহাৎ অবাপ দ্বিপদং নৃসিংহঃ' —(১৮/৩৫)। অর্থাৎ 'সিংহবিক্রমতুল্য নরসিংহ ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহের হাতেই মৃত্যুবরণ করলেন।' সুদর্শনের পিতা ধ্রুবসন্ধিকে কবি সূক্ষ্মভাবে 'নৃসিংহ' বলে উল্লেখ করেছেন। গুপ্তবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন মদ্যপ, কামুক, অরাজনৈতিক ও অসামাজিক মানসিকতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব। এই রাজার নাম অগ্নিবর্ণ। অত্যধিক নারীসঙ্গ ও মদ্যপানের জন্য, একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, তিনি কোন সন্তানের জন্ম দিতে পারেন নি। নিঃসন্তান অবস্থায় এই অগ্নিবর্ণের মৃত্যু হলে, উত্তরসূরীর অভাবে রঘুবংশের রাজসিংহাসনে আর কোন রাজা উপবেশন করতে পারেন নি। ফলে রঘুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়।

এখানে একটি মজার ব্যাপার লক্ষণীয়। কাব্যটির আঠারো সর্গে মাত্র তিপান্নটি শ্লোকের মধ্যে কবি নিষদ থেকে সুদর্শন পর্যন্ত একুশজন রাজাকে মঞ্চে এনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়েও দিয়েছেন। আর শেষ সর্গ উনিশ সর্গে অগ্নিবর্ণকে নিয়েই একটি সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অগ্নিবর্ণ, সমস্ত ব্যভিচারী-অপদার্থ রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি হিসাবেই যেন এখানে চিহ্নিত হয়েছেন। একুশজন নরপতির ইতিহাস, গুণগত ও পরিমাণগতভাবে, অগ্নিবর্ণের সামগ্রিক ইতিহাসের প্রতীকেই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই হিসাবে রঘুবংশের ভালোমন্দ মিশিয়ে মোট রাজার সংখ্যা দাঁড়ায়—দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র, কুশ এবং অগ্নিবর্ণ—সর্বসাকুল্যে সাতজন। গুপ্তবংশের মোট রাজার সংখ্যা—প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, পুরগুপ্ত এবং নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য—মোট সাতজন। তাহলে মোটামুটি আনুমানিকভাবে বলা যায় রঘুবংশের অন্যতম প্রধান ভূমিকা ভারতের গুপ্তরাজবংশের দলিলের সঙ্গে সংযুক্ত। কবির পক্ষে সরাসরিভাবে বলা মুশকিল বলে কবিকে রঘুবংশের কাল্পনিক ধারণার মধ্য দিয়ে, গুপ্তবংশের বাস্তব-বিশ্বাসে উপনীত হতে হয়েছে। যে-বাস্তব বিশ্বাসটি বাচ্যাতিশায়ী-ব্যঙ্গভাবের আবরণে আবৃত।

রঘুবংশের ভূমিকা প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলার আছে। এ-কথাটি যদিও অনুমানের বিষয়বস্তু তথাপি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রঘুবংশের ইতিহাসের মধ্যে কবি-জীবনের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে বলে

মনে হয়। গুপ্তবংশীয় শেষ রাজাদের কাছ থেকে কবি শেষ বয়সে বিশেষ মর্যাদা ও সুব্যবস্থা পান নি। তারই ফলশ্রুতি, শেষ রাজাদের প্রতি শ্লেষ ও বিদ্রূপে কবির লেখনী ঝলসে উঠেছে। গুণীজনের একমাত্র কাম্য—মর্যাদা ও সম্মান। তার ওপর আবার কবি-সাহিত্যিকদের মনটি হয় কোমল ও অনুভূতিপ্রবণ। অমর্যাদা তাঁদের কাছে মৃত্যুতুল্য। মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথার বর্বরতায় সমৃদ্ধ রাজন্যবর্গ কালিদাসের মতো কবিকেও সম্মান প্রদর্শন করতে পারেন নি। তাই রঘুবংশের শেষাংশে কবির রাজদ্রোহ মূর্ত হয়ে উঠেছে। মহারাজ অগ্নিবর্ণকে কবি মনের বেদনা-সঞ্জাত বিদ্রোহের অগ্নিতে যেন ভস্মীভূত করে দিয়েছেন।

এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কবি কালিদাস এ কাব্যে রাজ-তন্ত্রের বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন।' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়ে শ্রদ্ধেয় ছান্দসিক অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন—'সম্ভবত কবি কালিদাস রাজার বিরাগভাজন হয়েছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক সেনের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ। এঁদের বক্তব্যের পরি-প্রেক্ষিতে কমলকুমার সান্যালের উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত হয় নি বলেই মনে হয়। তিনি বলেছেন—'কালিদাস তো কেবলমাত্র অগ্নিবর্ণের ভোগ-বাসনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন—অন্য কোন রাজা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি।' —সান্যাল মহাশয়ের একথা গ্রহণীয় নয় বলেই মনে হয়। কারণ, একটিমাত্র সর্গে (আঠারো) কবি একুশজন রাজাকে তুলে ধরেছেন। এই রাজারা সব দিক দিয়েই এত অপদার্থ যে, এঁদের সম্বন্ধে কবির যেন বলার মতো কিছু নেই। এক প্রচণ্ড প্রচ্ছন্ন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ক্রোধ এই একুশজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে একমাত্র অগ্নিবর্ণের মধ্যেই প্রতিফলিত করে নিন্দা ও গ্লানিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। সুতরাং মহারাজ কুশ থেকে (অতিথি ছাড়া) অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত এই পঁচিশজন নরপতিই রঘুবংশের ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কালের জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং কবি অগ্নিবর্ণকেই কটাক্ষ করেছেন, তা ঠিক নয়। একাধিক রাজার প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ অগ্নিবর্ণে এসে প্রকট রূপ নিয়েছে। এই মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক সেনই রঘুবংশের শেষ রাজাদের যথাযথভাবে চিনতে পেরে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

রঘুবংশ সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত আগে বা পরে কালিদাস শকুন্তলা নাটকের শেষাংটি সমাপ্ত করেন। রাজানুকূল্য লাভে বঞ্চিত বৃদ্ধ কবি

তাই শকুন্তলার শেষাংশে বলেছেন—'হে আত্মভূ শিব (নীললোহিত) আমার ভব-যন্ত্রণা দূর করুন'! কোন্ বেদনা থেকে কবি এই ভাষায় কথা বলতে পারেন, তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই সহজবোধগম্য হয়ে ওঠে।

কালিদাস রচনাসমগ্রের ভূমিকাপর্ব সংক্ষেপে, পরিলেখ-মাত্রিক কৌশলে জানানো গেল। প্রকৃত গুণী সংস্কৃতসাহিত্যপ্রেমীরা এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে, ভারতের এক মহান কবির বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানা যেতে পারে।[১]

কালিদাসের কাল, দেশ ও জাতিত্ব

ভারতাত্মা-কালিদাসের রচনাসমগ্রের ওপর ব্যাখ্যা ও সমালোচনা, বিশ্বের সকল সভ্যদেশের সারস্বত-সমাজ তাঁদের সাধ্যাতীত জ্ঞান প্রয়োগে সুসম্পন্ন করেছেন, এখনও করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কালিদাসের কবি-মানস ও ব্যক্তি-মানসের যে দ্বন্দ্ব, তার হদিশ পাওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। কারণ, কালিদাসের কালে রাজনীতিক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাঁরা ছিলেন,তাঁরা তাঁদের সময় থেকে সুদূর অতীতের ইতিহাসকে খুঁজে পেতে যে সময় অতিবাহিত করেছিলেন, সেই সময়ের সামান্যতম অংশটুকুও, সমসাময়িককালের জন্য ব্যবহার করেন নি। যার জন্য কালিদাস এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের অনেক জ্ঞানী-গুণী, বর্তমানে শুধু গবেষণার নিরিখেই নিরুত্তর, নিরুদ্দিষ্ট ও আনুমানিক-সর্বস্ব বিষয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন। এর চেয়েও বড় কথা এই যে, একাধিক কাব্য-নাটকের রচয়িতা কালিদাস স্বয়ং, তাঁর রচনাবলীর কোন জায়গায় নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। তাঁর আত্মপরিচয় প্রকাশের পথে এই নীরবতার কি কারণ, তাও আমরা জানি না। শুধু এইটুকুই জানি, তিনি ছিলেন সংস্কৃত-সাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতীয় কবি। আর নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন হিন্দু।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের গবেষকবৃন্দ, স্ব-স্ব জাত্যাভিমান, ধর্মসচেতনতা এবং জন্মভূমির গৌরবের পক্ষপাতিত্বে, কালিদাসকে নির্দিষ্ট কালে, ধর্মে ও জাতিতে বসিয়ে আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছেন, কিন্তু আজপর্যন্তও কবির ব্যক্তিসত্তার তত্ত্ব-তালাশের প্রকৃত হদিশ নির্মিত হয় নি। কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়টি মহাকালের বুকে বুদ্বুদের মতো উঠছে আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। কে তাঁর পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভার্যা বা প্রেয়সী, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর রুচি-ই বা ছিল কেমন, বা তিনি কোন মাদকদ্রব্য সেবন করতেন কি না, তিনি আদৌ সুখী ছিলেন,

না কি ছিলেন দাগা-খাওয়া মানুষ, হাস্য-রসিক বা গম্ভীর প্রকৃতির—তার সব-কিছুই নির্মমভাবে মহাকালের ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। তাই কবির আবির্ভাব-কাল, জন্মস্থান, জাতিত্ব, ধর্মবোধ ও বিশ্বাস এবং পারিবারিক জীবনের বিশদ খবর কিছুই জানি না। এই না-জানার অপরাধ ও অপমানই আমাদের উন্মুখ করে তোলে তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার, অনুমানের দর্পণে কবির অস্পষ্ট জীবনকে খুঁজে পাবার। কারণ, কালিদাসের কবিত্ব দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে, কথা-শরীরপ্রাপ্ত প্রবাদপুরুষের স্বচ্ছ-সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই তো কবিকে কাব্যের বাইরে থেকেও জানবার এতো উৎসাহ।

মেঘদূতের কবি কালিদাসকে বাঙালী বানানোর প্রবণতা অনেক বছর আগে থেকেই চলে আসছে। এই প্রবণতাকে লক্ষ করে বাংলার বিশিষ্ট কালিদাস-বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রায় একশো বছর আগে মনীষী দেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'শকুন্তলায় নাট্য-কলা' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছিলেন—"…দেবেন্দ্রবাবু কালিদাসের স্থান ও কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা না করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, ঐ দুটো জিনিস লইয়া আমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গেল। কেহ বলিতেছেন কালিদাস বাঙালী, কেহ বলিতেছেন কাশ্মীরী, কেহ বলিতেছেন তিনি গৌড়-সারস্বত। তাহার অর্থ কি জানি না। কারণ, পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়ের মধ্যে গৌড়-সারস্বত কেহ আছেন কি না কোনও প্রমাণ পুঁথিতে তাহা লিখে না। …ইংরাজী ১৮৬৭ সালে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আড়াই পয়সার একখানি বই লিখিয়াছিলেন; তাহাতে লেখা ছিল—'যেমনি জনমাইলা অমনি কবিতাইলা।' চারিদিক দেখা নাই, শুনা নাই, এমনকি কালিদাসের বইগুলা ভাল করিয়া বুঝা নাই, শুনা নাই, সবাই কালিদাসের দেশ ও কাল নির্ণয় করিতে যাইতেছেন।"—বলাবাহুল্য শাস্ত্রীমশাইর এ-মন্তব্যটি, দেবেন্দ্রনাথ বসুকে কটাক্ষ করার জন্য লিখিত হয় নি। সেই সময়ে আনাড়ী হাতে কালিদাস গবেষণা কিছুটা 'জগাখিচুড়ি'-র রূপ নিয়ে নিয়েছিল বলেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ভূমিকার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী সমালোচনা করেছিলেন।

শাস্ত্রীমশাইয়ের উপরিউক্ত মন্তব্যটির সময় থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে প্রায় একশো বছর পার হয়ে গিয়েছে। তবু কালিদাসের বাঙালিয়ানা

নিয়ে সাম্প্রতিকতম কালেও গবেষণার অন্ত নেই। সামান্য কিছুকাল আগে, এক বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের ১৫।১২।৮৫ তারিখে 'রবি-বাসরীয়'-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট প্রবীণ প্রাবন্ধিক রাধামোহন রায় বলেছেন—"…'কালিদাস বাঙালী ছিলেন' এই মতের স্বপক্ষে কিছুটা যুক্তি থাকলেও থাকতে পারে। …কালিদাস-হরিদাস নামের তো বাংলার গ্রামগুলোতে এখনো ছড়াছড়ি।…অথচ অবাঙালীর মধ্যে এই নাম (কালিদাস) আক্ষরিক অর্থেই বিরল। এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়।"

আরও পরে, জনৈক সুলেখক তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছিলেন, —"মেঘদূতের কবি বাঙালী ছিলেন"। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল আরেকটি সংবাদপত্রের ৯।১১।৮৬ তারিখের 'সাপ্তাহিকী' বিভাগে। এই লেখক জানিয়েছিলেন—"…মেঘদূত, শকুন্তলা, রঘুবংশ, ঋতুসংহার প্রভৃতি কাব্য আর নাটকের উপকরণে কবির যে আবেগ তাতে স্পষ্ট হয়, মহাকবি কালিদাস ছিলেন গ্রাম বাংলার এক নিখুঁত বাঙালী"। কালিদাসের নিখুঁত বাঙালিয়ানার সমর্থনে তাঁর মতামত— (১) কালিদাসের জন্মভূমি—"প্রবহমানা নদী-বিধৌত" অঞ্চল, আর গ্রীষ্মে "মনোরম সুনিবিড় ছায়াঘন বৃক্ষরাজি বেষ্টিত ভূমি"—বাংলা ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে এ দৃষ্টান্ত ছিল না। এখনও নেই। (২) "গ্রীষ্মকালের পাকা আম যে দারুণ উপাদেয় 'শকুন্তলা'র ঐ কথাতেও তাঁর বাঙালিয়ানা পরিষ্কার।" (৩) ঋতুসংহারের হেমন্ত বর্ণনায় শালিধান আর বেলেহাঁস এবং শরৎ বর্ণনায়— "সব কিছু ছেড়ে মহাকবি কালিদাস বিশুদ্ধ বাঙালীর অতিপ্রিয় পুঁটি মাছের কথা লিখতে ভোলেন নি।…এসব বাঙালী হয়ে স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।" (৪) বিক্রমাদিত্যাদি বৌদ্ধ হলেও, কালিদাস স্বধর্মে থেকে ঈশ্বরবাদী ছিলেন। এবং সব-চাইতে জোরালো সমর্থন হিসাবে তিনি জানিয়েছেন — (৫) "বঙ্গজনপদের 'রোয়া' ধান সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে, কালিদাস ছিলেন শস্য-শ্যামলা গ্রামবাংলার একজন সাধারণ মানুষ। বাংলার প্রধান ফসল কমলা ধান। চারা তুলে রোপণ করাই যার উৎপাদন পদ্ধতি। এই কলমা বা রোয়া ধানের প্রসঙ্গ আছে 'রঘুবংশের'-'কলমা ইব…উৎখাত প্রতিরোপিতা।" মোটামুটি এই ক'টি প্রসঙ্গ তুলে উক্ত লেখক জানিয়েছেন, "মেঘদূতের কবি বাঙালী

অধ্যাপক ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর সৌজন্যে

ছিলেন"। এছাড়া হাওড়ার পণ্ডিতসমাজ এবং অন্যান্য কয়েকটি সংস্কৃতসেবী সাংস্কৃতিক সংস্থা, মেঘদূতের "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"—এই পংক্তিটির কথা স্মরণ করে প্রতি বছর ১ আষাঢ় 'কালিদাস জন্মজয়ন্তী' পালন করে থাকেন। এখন আমরা অপেক্ষায় আছি, কবে দেখব, কালিদাস-বিবাহ-বার্ষিকী, মৃত্যুতিথি ও কালিদাসের সন্তানের কোন কাব্য সম্পর্কে কোন লেখা প্রকাশিত হয় কি না।

কালিদাসের কাল নিয়ে কে কি গবেষণা করেছেন সে-বিষয়ের মধ্যে না-গিয়ে, সাহিত্যের ইতিহাসের সোজা-সাদা পথে, সময়-সীমার দুই মেরুবিন্দুর মধ্যিখানে আমরা কালিদাসের একটা সময় নিরূপণ করে নিতে পারি। এই 'সময়'টা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য হলেও, কালি-দাসকে খুঁজে পাবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত মৌর্য-সাম্রাজ্যহারী সেনাপতি পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নি-মিত্র, কালিদাসের নাটক "মালবিকাগ্নিমিত্রম্"-এর নায়ক। সুতরাং কালিদাস খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্বের লোক নন। দ্বিতীয়ত, সপ্তম-শতকের প্রথমেই বাণভট্ট ও "আইহোল" শিলালিপিতে তিনি কীর্তিত। অতএব ষষ্ঠ শতকের পরে তাঁর আবির্ভাব হয় নি। এই সুদীর্ঘ সাত শো বছরের মধ্যে মহাকবির জন্ম-সময় সম্পর্কে কোথাও কোন পরিচ্ছন্ন প্রমাণ নেই। মহাকালের হিসাবে এই সাত শো বছর কিছু না-হলেও, ইতিহাসের নিরিখে এই সময়ের ওজন কম নয়। এই সাতশো বছরের কূল-কিনারাহীন সময়-সীমার মধ্যে একটি কিংবদন্তী আমাদের অতি সামান্য-ভাবে সাহায্য করতে পারে। সেটি হ'ল—কালিদাস নামে এক ভারতীয় কবি বিক্রমাদিত্য নামে এক ভারতীয় নৃপতির সভাকবি তথা পারিষদের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। এই কিংবদন্তী এতো জোরদার যে, পণ্ডিত-অপণ্ডিত নির্বিশেষে এটিকে মেনে নিয়েছেন।

কালিদাসের কাব্য-নাটক পরিক্রমা করে যেমন কালিদাসের রচনা-মাধুর্য অর্থাৎ উপমা, অর্থগৌরব, পদলালিত্য তথা সৌন্দর্যবোধ অনুভব করা যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে বাচ্যাতিশায়ী-ব্যঙ্গভাবের কবি, তাও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ আলঙ্কারিক বিধানে তাঁর কাব্যগুণের মধ্যে 'উৎপ্রেক্ষম' বা অর্থালঙ্কারের সংযোজনা প্রবল। এটি সত্যিকারের বড় মাপের কবির একটি পরিচয়। বাচ্যাতিশায়ী বা উৎপ্রেক্ষার মূল লক্ষ্যটি হ'ল, প্রকৃত বস্তুতে বা কথিত বস্তুতে অন্যপ্রকার অর্থের বা

বিষয়ের সম্ভাবনা। অর্থাৎ যা বলা হচ্ছে, তা তো বটেই, এ ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। উক্ত বা কথিত বিষয়ের অন্তর্নিহিত সুরের মধ্যে আরও নিবিড়ভাবে আরেকটি বিষয় অকথিত-সত্তায় লুকিয়ে আছে—এমন কবিত্বের শৈলীকেই বলে 'বাচ্যাতিশায়ী-ব্যঙ্গভাব'। যেটিতে কালিদাস এক নিপুণ সিদ্ধহস্ত শিল্পী। দু-একটি উদাহরণের দ্বারা এ-বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

রঘুবংশের পুণ্যকীর্তি রাজাদের সম্পর্কে কবি বলছেন—"আ-সমুদ্র-ক্ষিতীশানাম্-আনাক-রথ-বর্ত্মনাম্।"—এই রাজারা আসমুদ্র হিমাচলের অধিপতি ছিলেন। তাঁদের রথ (বিমান) আকাশপথে গমনাগমন করত। অর্থাৎ উক্ত রাজারা অমিতপরাক্রমশালী ছিলেন। আসমুদ্র পৃথিবী এই কথার মধ্যে বীরত্বের ব্যঞ্জনায় আরেক ভারতীয় বীরের কথাও বাচ্যাতিশায়ীভাবে লুকোনো আছে। সেটি হ'ল সমুদ্র। ইতিহাসের বিচারে কিন্তু সমুদ্রগুপ্তও পরম পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে কবি বলছেন—"তনুপ্রকাশেস বিচেয়-তারকা প্রভাত-কল্পা শশিনেব শর্বরী"।—সকালে আকাশের তারাগুলি ক্রমে কমে গেলে এবং ডুবে গেলে রজনী-সুন্দরীর যে দশা হয়, সেরূপ হ'ল। এর মধ্যেও মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্রের নামটি, অর্থাৎ "চন্দ্রগুপ্ত" নামটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উৎপ্রেক্ষার জৌলুসে বর্তমান। চাঁদ ডুবে যাওয়ার অর্থ—'চন্দ্রগুপ্ত' হওয়া। আবার—"অন্বাস্ত গোপ্তাগৃহিণী সহায়ঃ" (রঘু-২।২৪)-এর বাংলা করলে দাঁড়ায়—মহারাজ দিলীপ তাঁর সহ-ধর্মিণীর সঙ্গে নিশিদিন একই পথে চলতে লাগলেন। এখানে "গোপ্তা" অর্থে যেমন মহারাজ দিলীপ বুঝিয়েছে, আবার গোপ্তা অর্থে, গুপ্তবংশের যে-কোন নৃপতিকেও বোঝাতে পারে। এ-ধরনের অসংখ্য শব্দ আছে যা কালিদাসের বাচ্যাতিশায়ীভাবের দ্বারা একটি প্রকাশ্য ও আরেকটি অপ্রকাশ্য অর্থে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই ব্যঞ্জনাকে বুঝতে গেলে নিবিড়-ভাবে কালিদাসের কাব্যে ধ্যানমগ্ন হতে হবে।

তাহলে সেই নিরবধি যুগ-যুগান্তরের কিংবদন্তীর সঙ্গে কালিদাসের রচনাশৈলীর নিরিখে, কালিদাসের কাল নিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো আরেকটা মন্তব্য জুড়ে দেওয়া যেতে পারে—কালিদাস হয়তো গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়কালে বর্তমান ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সাত শো বছরের অন্তর্বর্তী কালে, ইতিহাসের

বিচারে আমরা জেনেছি ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক বিক্রমাদিত্য ভারতের অধিপতি ছিলেন। ইনি তাঁর পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের নাম ধারণ করে "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করেন। গুপ্তবংশের এই বিক্রমাদিত্যের পিতার নাম সমুদ্র-গুপ্ত, যাঁর রাজত্বকাল ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৯ বৎসর। এই সমুদ্রগুপ্তের পিতা ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত—যাঁর রাজত্ব-কাল ৩১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯ বৎসর। অতএব ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের চন্দ্রগুপ্ত হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, যিনি ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৪০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হন ও "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই স্কন্দগুপ্তই মূলতঃ গুপ্তরাজবংশের উল্লেখযোগ্য শেষ সম্রাট। ইতিহাসের ভাষ্য অনুযায়ী, স্কন্দগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তরাজবংশের বিরাট সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সূক্ষ্মাকারে পতনমুখী হতে থাকে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত—যে বিশাল সাম্রাজ্য বিপুল আয়াসে আয়ত্তে এনেছিলেন, পরবর্তী সম্রাট স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, সেই সাম্রাজ্যের পতন-বীজটি সূক্ষ্মভাবে বপন করে যে-ভাঙনের সূত্রপাত করলেন, তারই পূর্ণতা দেখা গেল স্কন্দগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভাই পুরগুপ্তের সময়ে, অর্থাৎ ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কারণ, স্কন্দগুপ্ত ছিলেন নিঃসন্তান। পুরগুপ্তের পর এলেন নরসিংহগুপ্ত। ইনিও পূর্বপুরুষদের মতো উপাধি গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু 'বিক্রমাদিত্য' নয়—'বালাদিত্য', যার অর্থ নিষ্প্রভ শিশু-সূর্য। নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের সময়কাল ৪৮৫ থেকে ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রকৃত পক্ষে অদক্ষ নৃপতির দীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল সময়-সীমার মধ্যে গুপ্তসাম্রাজ্য তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাহলে ভারতের ইতিহাসে গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়সীমা ৩১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর ঊণার্ধ পর্যন্ত মোট দুইশত পঁচিশ বৎসর কাল। এখানে আরেকটি কথা বলার আছে। গুপ্তবংশের সমুদ্রগুপ্ত প্রমুখ কোন নৃপতিই বৌদ্ধ ছিলেন না। এঁরা সকলেই ছিলেন খাঁটি হিন্দু। এঁদের কুলদেবতা স্কন্দদেব বা কার্ত্তিকেয়। এ ছাড়া মহাকালের মন্দিরে এই

রাজবংশের নিত্য শিবপূজার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য গুপ্তরাজবংশীয় হিন্দু-নৃপতিরা বৌদ্ধরাজবংশীয় কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন।

সাত শো বছরের গণ্ডি থেকে আমরা দুশো পঁচিশ বছরের গণ্ডিতে এসে উপস্থিত হলাম। এই দুশো পঁচিশ বছরের কোন এক-সময়ে মহাকবি কালিদাস হয়তো জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সবশেষে কালিদাসের পরিণত প্রতিভার সংস্করণ 'রঘুবংশ' কাব্যের দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। রঘুবংশ বা সূর্যবংশের প্রথম পাঁচজন নৃপতি দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র—এঁরাই এই বংশের উত্তুঙ্গ নরপতি। তারপর কুশ থেকে বংশের পতনারম্ভ। বিশাল রঘুবংশের সিংহাসনে কুশের পর আরও বাইশজন নৃপতি এলেন। একে একে আবার চলেও গেলেন। এই আসা-যাওয়ার মধ্যে তাঁদের কোন ঐতিহাসিক কীর্তির স্বাক্ষর নেই। শেষ সম্রাটের পূর্ববর্তী সম্রাট, নাম পাওয়া যায় নৃসিংহ হিসাবে। গুপ্তবংশেও এক অপদার্থ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ছিলেন। রঘুবংশের নৃসিংহ রাজার পর শেষ রাজা হয়ে এলেন অগ্নিবর্ণ। অক্ষম-অপদার্থ-কামুক এই রাজার সন্তানাদি হয় নি। এবং যথেচ্ছ অনিয়মে দিনযাপনের ফলে অসময়ে অগ্নিবর্ণ মারা গেলেন। সূর্যবংশ তথা রঘুবংশের পতন হয়ে গেল। বাচ্যাতিশায়ী ব্যঙ্গভাবের কবি, কি বলতে গিয়ে কি বললেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা বিচার করবেন। তাই কালিদাসের কাল নিয়ে বিতর্কিত-ইতিহাসকে আর নাড়া চাড়া করব না।···

কালিদাসের জন্মভূমি তাহলে কোথায় ছিল? উজ্জয়িনী, কাশ্মীর, মালব, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, কলিঙ্গ, কেরল, কম্বোজ—কোথায়? কোথায় তাঁর জন্ম? নিশ্চয়ই নগরে নয়, কোন গ্রামে। গ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামল বনানী, দূরের পাহাড়, পাহাড়ের কোল থেকে বয়ে-আসা স্রোতস্বিনী, পাখির কাকলী, রাখালিয়া বাঁশি, কোরক থেকে পাঁপড়ির মোড়ক ভেঙে পুষ্পের পরিণতি—এসব তো নগরের রূপ নয়। নিঃসন্দেহে তাঁর জন্ম কোন গ্রামে। কোন্ সেই গ্রাম? যে-গ্রামের ঝোপে-ঝাড়ে নানারকম ফুল। যাদের নাম শ্যামা, প্রিয়ঙ্গু, কঙ্কেলী, নমেরু, অশোক, কর্ণিকার, মন্দার, লোধ্র, মধুদ্রুম, দন্তপত্র, বন্ধুজীব, পারিজাত, সন্তান, শিমূল, হরিচন্দন, অরবিন্দ, নীলোৎপল আর পদ্ম। সারা বাংলা চষে বেড়ালেও পদ্ম, নীলোৎপল আর শিমূল ছাড়া আর কোন ফুলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য কোন পুষ্পপ্রিয় বাঙালী যদি শখ করে তার ছাদে অশোক, কর্ণিকার,

লোধ্র বা প্রিয়ঙ্গু টবে সাজিয়ে রাখে, সেকথা আলাদা। আর পাখি? কবির চোখে যে-পাখি বারবার দেখা দিয়েছে বিরহের প্রতীকে, সেই পাখির নাম 'রথাঙ্গনামা'। কী অসাধারণ নাম! যাকে সোজা কথায় কবির ভাষ্যকারেরা ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, 'চক্রবাক'। কবির সব কাব্যনাটকেই চক্রবাকের ছড়াছড়ি। রাঢ়, বরেন্দ্রভূমিতে চক্রবাক বিরহে সারারাত কাঁদে কিনা জানা নেই। তবে মালবের পশ্চিমে দশপুর বা দশোর গ্রামে উপরিউক্ত ফুল ফোটে, চক্রবাক কাঁদে—কবি তাঁর কাব্যের পাতায় পাতায় সেকথা পাঠককে শুনিয়েছেন। এই দশোর গ্রামই যুগের পর যুগ কাটিয়ে এখন 'মান্দাশোর'-এ রূপায়িত হয়েছে। ইতিহাসের নিরিখে মান্দাশোর-শিলালিপির অক্ষরাবলী উদ্ধার হয়েছে। সেই শিলালিপি জানিয়েছে, শীত আর বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্য সত্তা, আর দশোরের বৈশিষ্ট্য। ঋতুসংহারের কাব্যলীলা। শিলালিপি ঋণী, না কালিদাস ঋণী—তা আমাদের জানা নেই। যদি কেউ জোর করে বলে, তবেই বুঝতে হবে, ইতিহাসের উপেক্ষায় প্রক্ষিপ্ত অনুমানের প্রসববেদনা শুরু হয়েছে।

মেঘদূত কাব্যে কবি মেঘকে রামগিরির আশ্রম থেকে হিমাচলপ্রদেশের অলকাপুরীতে যখন কল্পিত দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি সোজা পথে না পাঠিয়ে উজ্জয়িনী ও দশোর গ্রামের ওপর দিয়েই পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য জানা যায় না, এই পথনির্দেশের মূলে কবির জন্মভূমির প্রতি কোন আকর্ষণ বা পক্ষপাতিত্ব ছিল কি না।

কবি সাহিত্যিককে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক দেশ ভ্রমণ করতে হয়। কালিদাস রচনাবলীর অভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা বলা যেতে পারে, কালিদাস হয়তো কমপক্ষে চারবার ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। এই চারবারের হিসাবটা এই রকম—একবার মেঘদূত কাব্যের আলোকে, দ্বিতীয়ত, রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে, তৃতীয়ত, ষষ্ঠ সর্গে এবং চতুর্থত, একই কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে। এই চারবারের যাত্রায় কোথাও কবি একই পথে দ্বিতীয়বার ভ্রমণ করেন নি। এই পথ-সঙ্কেত বা নিশানাটির একটু আলোচনা প্রয়োজন আছে। প্রথমে মেঘদূতে, রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত মেঘের পথ নির্ধারণ করবার সময়ে, বিরহী যক্ষের মুখ দিয়ে কবি উত্তর ভারতের সম্পূর্ণ বর্ণনা করেছেন। বর্তমান মধ্যভারতের অন্তর্গত সরগুজা আঞ্চলিক রাজ্যের অমরকণ্টক (পূর্ব নাম রামগিরি) থেকে

ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী কৈলাস পর্বত পর্যন্ত গমনপথের বিবরণ এই রকম : রামগিরি থেকে উত্তর দিকে মালক্ষেত্র, আম্রকূট হয়ে সোজা উত্তরে বিদিশা। বিদিশা থেকে 'মেঘ' পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তরে যমুনা এবং দক্ষিণে নির্বিন্ধ্যা, সিন্ধু, বেত্রবতী ও শিপ্রানদীকে রেখে মধ্যভারত উজ্জয়িনীতে। সেখান থেকে আরও পশ্চিমে ধাবিত হয়ে গম্ভীরা নদী পেরিয়ে দেবগিরি পাহাড়ের গায়ে দশোর গ্রামে। দশোর গ্রাম থেকে এবার উত্তর-পূর্ব কোণ ধরে অলকার পথে। যে-পথের উত্তর-পশ্চিম কোণে সরস্বতী নদী। বিপরীত দিকে ব্রহ্মাবর্ত-কুরুক্ষেত্র। সরস্বতীর আরও ওপরে হংসদ্বার ঠিক বিপরীতে মানস সরোবর। তার দক্ষিণে, নিচুভূমিতে হিমালয়কে ছুঁয়ে অবস্থান করছে পুণ্য সতীপীঠ কনখল। মানস সরোবর থেকে উত্তর-পূর্ব কোণ ধরে সোজা অলকাপুরী। তার সোজা উত্তরে কৈলাস। এই হ'ল মেঘদূতে কালিদাসের যাত্রাপথ। এখন কথা হ'ল, রামগিরি থেকে বিদিশা অবধি এসে, অল্প পথের ব্যবধানে উত্তরদিকে ছুটলেই তো কনখল চলে যাওয়া যেত। তা না গিয়ে বিদিশা থেকে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে প্রায় চারগুণ রাস্তা অতিক্রম করে উজ্জয়িনী, গম্ভীরা, শিপ্রা, গন্ধবতী, দেবগিরি, অবশেষে দশোর গ্রামে এসে, উত্তর-পূর্ব কোণ ধরার অর্থ কি ? আমরা জানি না, 'দশোর গ্রাম' তাঁর জন্মভূমি কিনা, কিন্তু এটা জানি যে, যে-মানুষ যত দূরেই থাক না কেন বা যাকে যতদূরই যেতে হোক না কেন—সে কিন্তু নাড়ীর টানের স্রোতে, মজ্জার মাদকতায় বারবার মাতৃভূমির কথা ভাবে, যাওয়ার পথে ঘোরাপথ হলেও, একবার মাতৃভূমিকে না দেখে, কেমন যেন স্বস্তি পায় না। শুধু তাই নয়, মেঘদূতের কবি, 'পূর্বমেঘ'-এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে স্মৃতিমন্থন করেছেন—উজ্জয়িনী, শিপ্রা, গম্ভীরা, দেবগিরি আর দশোর গ্রামের। মেঘদূতের কোথাও বঙ্গদেশের নামগন্ধও নেই। বলা বাহুল্য, রামগিরি থেকে বঙ্গের সীমা ছুঁয়ে অলকার দিকে গেলেও পথের ব্যবধান কম হ'ত।

দ্বিতীয় ভ্রমণ রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে। মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রার মধ্য দিয়ে। কালিদাস রঘুকে দিয়ে দিগ্বিজয় যাত্রার শুরুতেই, রঘুর প্রবল বিক্রমের কথা জানিয়ে, অসংখ্য সৈন্যবাহিনীর কথা শুনিয়ে যাত্রারম্ভ করালেন অযোধ্যা থেকে—'পূর্বসাগর গামিনীম' অর্থাৎ পূর্ব সাগরের অভিমুখে—প্রাচ্যদেশ সমূহের প্রতি। ঐতিহাসিকভাবে

উল্লেখযোগ্য এই যে, রঘুরাজার সময়ে বঙ্গদেশের উৎপত্তিই হয় নি। তখন এদেশের নাম ছিল পুণ্ড্রদেশ। গুপ্তবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ সুনিশ্চিতভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। গুপ্তবংশীয় মহাবীর সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সমুদ্রগুপ্তের বীরত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি সমগ্র আযাবর্ত, উত্তরবঙ্গ, রাঢ়বঙ্গ, স্তম্ভপুর ইত্যাদি বঙ্গীয় অঞ্চল ও সমগ্র মধ্যভারত জয় করেন। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফা-হিয়েন স্তম্ভপুরে আসেন। তিনিও সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ আক্রমণের কথা বলেন। এবং এও বলেন, সমুদ্রগুপ্তের সময়ে বঙ্গ ও সমগ্র প্রাচ্যদেশের নৃপতিরা অত্যন্ত দুর্বল ও আদর্শহীন তথা আত্মকলহে নিমগ্ন ছিলেন। এই স্তম্ভপুরের পরবর্তী নাম, তাম্রলিপ্ত বা তমলুক। তাহলে বঙ্গদেশীয় নৃপতিরা দুর্বল ও আদর্শহীন ছিলেন বলেই সমুদ্রগুপ্ত প্রথম পর্বে সমগ্র শক্তি নিয়ে বঙ্গদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কালিদাসের না জানার কিছু নয়। রঘুরাজার নাম নিয়ে কালিদাস, সমুদ্রগুপ্তকে দুর্বল বঙ্গদেশের ওপর তাড়িয়ে আনলেন। বলা বাহুল্য, এতে করে কালিদাসের বঙ্গদেশপ্রীতি বা বাঙালিয়ানার পরিচয় তো মিললই না, অধিকন্তু বাংলার রাজাদের ভেতো-বাঙালীর মতো মনে করেই—"উৎখাত প্রতিরোপিতাঃ"—বঙ্গের এই প্রধান নিজস্ব বস্তুর সঙ্গে, দর্শনপটু কবি, পরাজিত স্থানচ্যুত এবং বশ্যতা স্বীকার করায় আবার রঘুর দ্বারা (প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা) প্রতিষ্ঠাপিত বা প্রতিরোপিত নৃপতিদের তুলনা করলেন। 'কলম' অর্থাৎ ধানবীজ বপন করে চারা তৈরি করা। ক'দিন পর সেই চারাধান তুলে অন্যত্র বোনা হয়ে থাকে। একেই কবির ভাষায়—'উৎখাত প্রতিরোপিতাঃ' বলা হয়েছে। এর দ্বারা কবির বাঙালী-প্রীতির বা নিজের বাঙালিত্বের গর্ব থেকে অপমানটাই বড় বলে মনে হয়। বাঙালী হলে তিনি এটা কখনই করতেন না। কবি কি বলছেন, তার থেকেও লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, কী উদ্দেশ্য নিয়ে বলছেন, তার বিচার করা। কারণ, ভুলে গেলে চলবে না, তিনি যে রাজার রাজসভা-কবি তাঁরই পূর্বপুরুষ সমুদ্রগুপ্তের বিজয়াভিযানে যে যে দেশ পর্যুদস্ত, সেই সেই দেশের প্রতি কবির মৃদু সমবেদনাটুকুও না থাকারই কথা।

রঘুরাজার ভ্রমণপর্বে, মাত্র দুটি শ্লোকে প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গদেশের কথা কবি পাঠককে শুনিয়েছেন। সেই শ্লোক দুটি রঘুবংশের ৩৬-৩৭

শ্লোক। রঘুবংশে মোট উনিশটি সর্গ আছে, এবং ১৫৬৯টি শ্লোক আছে। প্রতিটি শ্লোক অসাধারণ—অনবদ্য—অভিনব। কিন্তু দেড় হাজারের ওপর শ্লোকাবলীতে নিবদ্ধ রঘুবংশের মাত্র দুটি শ্লোকে বঙ্গদেশ ঘোষিত। তাও আবার ভেতো বাঙালীর পরাজিত রূপটিকে 'কলমা'-র স্বরূপে তুলে ধরার মধ্যে। এছাড়া, কবির তিনটি কাব্য ও তিনটি নাটকের কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও বঙ্গদেশ আত্মপ্রকাশ করে নি। এর পরেও যদি স্বাজাত্য অভিমান-বোধ ভারতের মহাকবিকে বাঙালী বলে দাবি করে, তাহলে সত্যিই সেটা দুঃখজনক।

রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের ভ্রমণে বঙ্গের পর উৎকল, কলিঙ্গ, মহেন্দ্র পর্বত, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, কর্ণাটক, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণভারত, পারস্য-দেশ, সিন্ধুনদীর তীর ধরে কম্বোজ এবং শেষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্তমান কামরূপ) অবধি স্থানসমূহ চিহ্নিত হয়েছে।

রঘুর ত্রয়োদশের বর্ণনা—লঙ্কানগরী থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত। যে-পথে আদিকবি বাল্মীকি ভ্রমণ করেছেন, হুবহু সে-পথ না ধরে একটু ঘুরে বেঁকে কালিদাস,রাম-সীতাকে অযোধ্যায় পৌঁছে দিয়েছেন।

সমগ্র ভারতভ্রমণ পর্বে, কালিদাস একাধিক রাজ্যে, একাধিক ভাব ও ভাষায় তার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশ তাঁর উজ্জ্বল লেখনীতে বড়ই উত্তাপহীন ও নিষ্প্রভ। সুতরাং কালিদাসকে আর যা-ই হোক, বাঙালীর গণ্ডিতে ফেলে কখনই গর্ব করা যায় না।

"প্রবহমানা-নদীবিধৌত" অঞ্চল যদি কালিদাসের জন্মভূমি হয় তাতে ক্ষতি কি? গম্ভীরা, শিপ্রা, বেত্রবতী, সিন্ধু, নির্বিন্ধ্যা—এগুলিও তো নদী। সেই নদসমূহ বিধৌত গ্রাম তো দশোরও। আর পুঁটি মাছ ও আম কি বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না? আরেকটি কথা এই যে, গুপ্তবংশের সমুদ্রগুপ্ত-চন্দ্রগুপ্ত-কুমারগুপ্ত প্রমুখ কোন নৃপতিই বৌদ্ধ ছিলেন না। এঁরা সকলেই খাঁটি হিন্দু ছিলেন। মূলত হিন্দু সভ্যতার সুবর্ণযুগ ছিল গুপ্তরাজ বংশের আমলে। এঁদের কুল-দেবতা ছিলেন স্কন্দদেব বা কার্ত্তিকেয়। এছাড়া মহাকালের মন্দিরে এই রাজবংশের নিত্য শিবপূজার ব্যবস্থা ছিল। বরং বলা যেতে পারে হিন্দু হয়েও এঁরা বৌদ্ধধর্মাদির ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না।

কালিদাসের নামের মধ্যে বাঙালিত্ব আছে, এ-দাবি নিতান্তই হাস্য-কর। বাঙালীর নাম যদি সিদ্ধার্থ, বুদ্ধদেব, জানকীনাথ, মথুরাপ্রসাদ,

ভীম, বশিষ্ঠ ইত্যাদি হয়, তাহলে অবাঙালীর নাম কালিদাস, দুর্গাদাস, শ্যামাদাস হতে আপত্তি কি! এই নাম-প্রসঙ্গের কথায়, গ্রামবাংলার একটা ছড়ার কথা মনে পড়ে যায়—

"কানার নাম পদ্মলোচন অমর গেল মারা।
ধনঞ্জয় হাল বায় কুবের সর্বহারা।"

এবং কুমার সম্ভব হইল

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে চলেছে অতি-ভয়াবহ অত্যাচার। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান—সব-কিছুর সোচ্চার দাবী আকাশ-বাতাসে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে সৃষ্টির রসাতল যাত্রাকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। দেবতার শক্তি, মানবের বুদ্ধি—সর্বস্তরেই বিপর্যস্ত হয়েছে—দানবের নারকীয় অপশাসনের বীভৎস কর্মসূচীতে। সংগ্রাম-ঐক্য-সংগ্রামের পদ্ধতিতে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ দেব-জনসাধারণ পরাজিত হচ্ছে বারংবার। পদে পদে ব্যর্থতার শোচনীয় বাস্তব রূপটি মূর্তিমান হয়ে উঠছে তাঁদের মিছিলের গতিপথে। কিন্তু মুক্তির পথ কোথায়? দেবঘাতী, নরঘাতী, শিশুঘাতী দানবের হাত থেকে মুক্তিলাভের প্রকট-প্রত্যয় সম্বল করে বিরাট মিছিল এগিয়ে চললো জগৎস্রষ্টার কেন্দ্রীয় রাজধানীর অভিমুখে। বিরাট বিক্ষোভ-মিছিলের প্রচণ্ড শ্লোগান যখন জনমত-দেবমত নির্বিশেষ ধ্বনিত হতে হতে কেন্দ্রীয় রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলছিল, তখন দানবসম্রাট ইচ্ছে করেই সমাবেশ-বিরোধী আইন-জারি না-করে শুধু কটাক্ষের হাসি হেসেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন, মিছিলকারীদের ভাবী আবেদন ব্যর্থ হবেই হবে। কিন্তু অত্যাচারী দানবসম্রাট মিছিল ভেঙে না-দেওয়ায় তাঁর রাজত্বের আর কিছুটা ভেঙে দিয়েছিলেন। তারপর সেই হাজার হাজার শোষিত দেব-জনতা এসে উপস্থিত হলেন বিশ্বপালকের পার্লামেণ্ট ভবনের সামনে। মিছিল অপেক্ষা করতে লাগল পার্লামেণ্টের করিডোরে। প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বপালকের কাছে স্মারকলিপি নিয়ে উপস্থিত হলেন তিনজন নেতৃ-স্থানীয় দেবতা—পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বাক্‌পতি, শ্রেষ্ঠ ধনপতি আর স্বয়ং দেবপতি।

বিরাট পার্লামেণ্ট-প্রাসাদ। পৃথিবীর সুন্দরতম জিনিস দিয়ে সুসজ্জিত, সুঅলংকৃত বিশাল সভার ঠিক মাঝখানে অমল-ধবল মণ্ডপে স্বর্ণছত্রা-চ্ছাদিত, অসংখ্য দেব-দেহরক্ষী পরিবৃত জগৎপিতা বিশ্বপালক উপবিষ্ট। বিশ্বের চিরন্তন কালের সাক্ষী, পূর্বোত্তর ইতিহাসের প্রবক্তা, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা

—আজ সম্মুখীন হলেন এক বিদ্রোহাত্মক দাবী-সনদের মীমাংসক রূপে। অতি ধীরে, বিনম্র পদক্ষেপে, শান্তকণ্ঠে করুণসুরে সেই তিনজন দেব-প্রতিনিধি তাঁদের সমস্যাজর্জর অধিকারহীনতার স্মারকলিপি পেশ করে বললেন—প্রভু! আমাদের বাঁচান। বিশ্বপালের ব্যক্তিগত সচিব তাঁকে স্মারকলিপিটি পড়ে শোনালেন। স্মারকলিপির সম্পূর্ণ বক্তব্য শুনে বিশ্বপাল তাঁর মৃদু-গম্ভীর, ধীরোদাত্ত, সুললিত কণ্ঠে বললেন—হে দেবগণ! তোমাদের যাবতীয় সমস্যা, খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষার পরাধীনতা ও দানবসম্রাটের নিপীড়ন—এ সবই শুনলাম। কিন্তু তোমাদের সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগতভাবে আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ আমি দানবসম্রাটের সাধন-শুল্কের দ্বারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্রীত হয়ে গেছি। তাছাড়া এই অত্যাচারের মেয়াদ আমি কোন আইন-জারি করে বা সংবিধান সংশোধন করে কমাতে পারব না।

বিশ্বপালের এই কথা শুনে দেব-প্রতিনিধিদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। দেবপতি, বিশ্বপালের অলক্ষ্যে বাক্‌পতিকে ইশারা করলেন। দেব-পতির ধারণা, বাক্‌পতির বাক্‌চাতুর্যে বিশ্বপাল যদি কোনক্রমে কিছু নমনীয় হন। সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌পতি তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে তৎপর হয়ে অবর্ণনীয় ভাষায় ও অসাধারণ ভাব-ব্যঞ্জনায় বিশ্বপালের পদধূলি নিয়ে বলতে লাগলেন—হে মহত্তোমহীয়ান, বিশ্বতোমুখ, দেবপ্রিয়, মঙ্গলকারী জগৎ-তারণ মহাপ্রভু! আপনি সাধনার শুল্কেই প্রীত, এ-তত্ত্ব আমরাও জানি। কিন্তু সাধনারও তো দুটি দিক আছে। সকাম সাধনা ও নিষ্কাম সাধনা। সকাম সাধন যত উচ্চমার্গের হোক না কেন, তাতে তো মঙ্গলের মূর্ত মুক্তিটি অনুস্যূত হয় না! মোহভঙ্গের চরম ও পরম প্রাপ্তিযোগ সেই সকাম সাধনের মধ্যে তো নিহিত থাকে না! যে-সাধনায় বিশ্বকল্যাণের চৈতন্যময়, ইন্দ্রিয়াতীত অখণ্ড-আমিত্ব সর্বব্যাপী অহংকারের বিলোপ সাধন করে, আত্মহারা অখণ্ড আনন্দে বিশ্বকে চিরশান্তির স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়া দান করে—সেই সাধনাই বুধাকাঙ্ক্ষী নিত্য অভিপ্রেত সাধনা। সেই সাধনাই তো আপনার 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' রূপ নিষ্কাম কাম্য সাধনা। সেই সাধনার অনন্ত সৌন্দর্যে মোহিত হয়েই তো আপনি অনেককে নিজের অঙ্গে অনঙ্গরূপ দিয়ে অনন্ত করে রেখেছেন। আবার অনেককে নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বগতির সীমায় বদ্ধ করে রেখেছেন। আর যদি শুল্কের কথাই বলেন, তবে বিনা সাধনাতেই তো আমরা অপর্যাপ্ত শুল্ক ধনপতির কাছে

আবেদন করতে পারি। পরিশেষে বলি, যে-বর্ণের সমন্বয়ে এই শব্দ-সমষ্টি আপনার কাছে নিবেদন করলাম, তাও আপনারই অসীম কৃপায় আমরা প্রাপ্ত। আপনি তো শব্দেরও ধারক ও বাহক, সুতরাং আমার আবেদনে কোনরকম ঔদ্ধত্য থাকলে আমাকে যথাবিহিত শাস্তি দিতে পারেন। আপনার শাস্তিও আমাদের কাছে অমৃতস্বরূপ।

বাক্‌পতির সনির্বন্ধ যুক্তিবহ, মনোরঞ্জনকারী কথায় দেবপতি মনে মনে আশ্বস্ত হলেন। বিশ্বপালের প্রত্যুত্তর দেওয়ার পূর্বেই, আগ-বাড়িয়ে এসে বললেন, হে মহাভাগ! জানি আপনি সাধকের ভক্ত ও ভৃত্যের মতো। একাগ্রচিত্ততাই সাধকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুপণ্ডিত বাক্‌পতি যদিও সাধনার শ্রেণীকরণ আপনাকে বোঝাতে চেয়েছেন—তবু আমার মনে হয় আপনার ঈপ্সিত কর্মে কারোও বাধা উচিত নয়। কারণ আপনি বিশ্বমঙ্গলের প্রতিভূ। তাই আপনি যা-ই করুন না কেন সে-কাজে অকল্যাণ কিছু হতে পারে না। আপনার কাছে বিনীত প্রার্থনা, আপনি ব্যক্তিগতভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও, আপনি আমাদের কিছু পরামর্শ দিন, যাতে করে আমরা দানবসম্রাটের অকল্যাণের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি।

কিছুক্ষণের জন্য সমগ্র পার্লামেন্টভবন নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। গভীর চিন্তাজড়িত বিশ্বপালের মুখমণ্ডলে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে, সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—বাক্‌পতির কথা শুনলাম। দেবপতির কথাও শুনলাম। সেই কথার খণ্ডন করার অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু আমার হাতে এত সময় নেই। যাহোক, তোমাদের আবেদনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তোমরা বিপদগ্রস্ত। তোমরা স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামিল হয়েছো। এই সাধু সঙ্কল্প কার্যকরী হওয়া উচিত। তোমাদের ঐক্য আমাকে আনন্দ দিয়েছে। তোমাদের নেতৃবৃন্দ—বাক্‌পতি, ধনপতি ও দেবপতি সকলেই সুযোগ্য। তোমাদের দেব-সংগঠন আছে, দেব-নেতা আছে। কিন্তু এ-সবই নিরস্ত্রে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের হাতিয়ার। যার বিরুদ্ধে তোমরা লড়তে চেয়েছো—সেখানে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সম্ভব নয়। সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়া এই বৈপ্লবিক যুদ্ধে তোমাদের জয়লাভ অসম্ভব। তাই তোমাদের একজন সুদক্ষ দেব সেনাপতির প্রয়োজন, যে-দেব সেনাপতি তোমাদের ঐক্যবদ্ধ যুক্ত মোর্চার মধ্যে নেই।

বিশ্বপালের এই রাজনৈতিক প্রস্তাব শুনে দেবপতি, বাক্‌পতি, ধনপতি—সকলেই আনন্দে, বিস্ময়ে ও নিজেদের দলীয়-দুর্বলতার সত্যতায় সজ্জিত হয়ে সসম্ভ্রমে দেবপতি বিশ্বপালকে অনুরোধ করলেন—হে প্রভু! আমাদের নিগূঢ় দুর্বলতা আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। আপনিই বলে দিন, আমাদের কি উপায় অবলম্বন করলে সুযোগ্য দেব-সেনাপতির সন্ধান আমরা পাবো।

বিশ্বপাল বললেন—তোমরা এত ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমাদের মুক্তিকামী চিন্তার আভাস পেয়েছি। তোমরা যখন পরামর্শ চেয়েছো তখন সাধ্যমতো পরামর্শ ঠিকই দেবো। কিন্তু কাজটি বড় কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। পদে পদে তোমাদের ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। বিঘ্ন দেখা দিলে হতাশ হলে চলবে না। দেব-নেতৃবৃন্দ হাত জোড় করে বিশ্বপালের কথা শুনতে লাগলেন। বিশ্বপাল আবার বলতে শুরু করলেন—যে সুযোগ্য দেব-সেনাপতির কথা বলেছিলাম, সেই দেব-সেনাপতির সেনাপতিত্বে তোমরা দানবসম্রাটের সঙ্গে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জয়লাভ করবেই করবে ও তোমাদের স্বাধিকার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এবার শোনো এই সুযোগ্য দেব-সেনাপতির সন্ধান লাভের উপায়। —তোমরা সকলেই জানো এই দেশের উত্তর খণ্ডে ও তোমাদের ধনপতির রাজধানীর সামান্য দক্ষিণাংশে এক বিরাট শিলাময় তুষার-সাম্রাজ্য আছে। সেই সাম্রাজ্যের সম্রাট অত্যন্ত জ্ঞানী গুণী ও বংশগৌরবে মহান, তথা গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁর একটি অপরূপা সুন্দরী কন্যা আছে। সেই কন্যার সঙ্গে আমারই সমশক্তিসম্পন্ন, ধনপতির রাজ-ধানীর স্রষ্টা, আত্মপ্রচারবিমুখ ও আত্মভোলা, সংযতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের বিবাহ ও সন্তানোৎপত্তিতেই সেই দেব-সেনাপতি সম্ভব হবে।

এই আশীর্বাদাস্তিক ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বপাল স-সচিব পূর্বনির্ধারিত বন্দোবস্তক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর—দেবপতি, বাক্‌-পতি ও ধনপতি, দেব-সেনাপতির সম্ভব কাহিনী শুনে মিছিল নিয়ে আবার ফিরে এলেন তাঁদের রাজ্যে। ফিরে এসেই দেবপতি একটি সভা আহ্বান করলেন।

দুই

বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু সভা চলবে 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে সভার প্রাক্কালীন

মুহূর্তে। মাঠে ময়দানে দানবসম্রাট-বিরোধী প্রকাশ্য সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই দেবপতির বাসভবনেই সভা বসেছে। দানব-সম্রাটের আপাৎকালীন জরুরী ঘোষণায় বাধ্য হয়েই দেবপতির নিজের বাসভবন—'আখণ্ডল-আলয়'তে সভা ডেকেছেন, তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থান-সংকুলান নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন দেব-প্রতিনিধিরা। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে সব-চাইতে ব্যস্ত বরুণদেব—দূরদূরান্তরাগত দেবতাদের তুষ্টিবিধানের জন্য। এই সভায় সাংবাদিকের নিমন্ত্রণ রদ্ করা হয়েছে। না-রদ করলে হয়তো সভার মূল বক্তব্যটাই আগে থেকে ত্রিভুবনে ফাঁস হয়ে যাবে। সভাপতি বাক্‌পতি এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন। গুরু গম্ভীর সুমার্জিত ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন,—উপস্থিত দেববৃন্দ! আমরা তিনজন, যথাক্রমে আমি, দেবপতি ও ধনপতি, কয়েক দিন আগে বিশ্বপালের কাছে আমাদের পরাধীন জীবনের আশু-সমাধান জন্য 'ডেপুটেশন্' দিয়েছিলেন। নানাবিধ আলোচনার পর, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যেই আমরা একটা মীমাংসায় আসতে পেরেছি। আজকের এই সভাকে কেন্দ্র করে দানব-শাসকের কৌতূহল দেখা দিতে পারে মনে করেই আমরা এই সভার প্রচার-কার্য একেবারে বন্ধ রেখেছি। এমনকি সাংবাদিক-সংগীতও এখানে অনুপ্রবিষ্ট হয় নি। এতে, ধান্যকুট্টনী আরূঢ়-কলহ-কালহারী, অসন্তুষ্ট হলে আমাদের কিছু করার নেই। তাই আশা করি সভার গোপনীয়তা সম্পর্কে আপনারা খুব সজাগ ও সচেতন থাকবেন। এই সভায় কোন ভাষণের কর্মসূচী নেই। আমার পরবর্তী বক্তা স্বয়ং দেবপতি সভার মূল বক্তব্য নির্দেশ হিসেবে দান করবেন। সেই নির্দেশ যথাযথ পালনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ভাবী ধর্মবিপ্লবের যুদ্ধে জয়লাভ করবই, আশা রাখি। আপনাদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং বিশ্বপালের পরোক্ষ সমর্থন আছে। এবার আপনাদের কাছে আসছেন স্বয়ং দেবপতি।

সুঅলংকৃত, কূটনৈতিক-বুদ্ধিসম্পন্ন স্বয়ং দেবপতি তাঁর বক্তব্যে জানালেন—এখনই আমাদের এত আনন্দ উত্তেজনার সময় আসে নি। আমরা বিশ্বপালকের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছি মাত্র। সব-কিছুই আমাদের করে নিতে হবে, অতএব আমাদের সংগ্রাম-চলা-পরিস্থিতিতে আত্মসন্তুষ্টি হতাশা এই উভয়ের একটিও গ্রহণ করলে চলবে না। আমি

মনে করি, আন্দোলন ও বিপ্লব আমদানি রপ্তানি করা সম্ভব নয়। বিপ্লবের পরিস্থিতি আপনা থেকেই তৈরি হয়। সংগ্রামের মূল নীতি ঐক্য, একথা যেমন সত্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যক্তির সাহায্যও সংগ্রামের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ঘটনা বলা যায়। আমরা বিশ্বপালের কাছ থেকে যে-নির্দেশ পেয়েছি তাকে সার্থক রূপ দিতে গেলে কিছু গুপ্তচরের প্রয়োজন আছে। কী কাজে কোন্ গুপ্তচর নিযুক্ত হবে, তা আমি ধীরে ধীরে নির্দেশ দেবো। আমাদের ধনপতিদের সাম্রাজ্যের যিনি আদি বাসিন্দা তিনি সকল দেবতার শক্তিকে সম্মিলিত করলে যে শক্তি হয়, সেই শক্তির অধিকার এবং বিশ্বপালের সমশক্তিসম্পন্ন। তিনি খুব আত্মপ্রচার বিমুখ বলে, আমাদের নির্বাচনে প্রার্থী বা ভোট দাতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন না, তাই পরিষদীয়-রাজনীতিতে তাঁর খুব নাম ডাক নেই সত্য, কিন্তু তাঁকে আমাদের এখন বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্বপাল জানিয়েছেন, শিলাময় তুষারসম্রাটের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে সেই আত্ম-ভোলা মহাপুরুষের আদিরসাত্মকমিলনে যে কুমার জন্মগ্রহণ করবে, সে-ই দেব-সেনাপতিত্ব লাভ করে আমাদের দানব-বিরোধী যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবে এবং সশস্ত্র সংগ্রামে দানবনিধন করবে। আরেকটি খবর এই যে, আমরা সাংবাদিক সূত্রে জানতে পেরেছি, শিলাময় তুষারসম্রাট তাঁর কন্যাকে জিতেন্দ্রিয় সেই আত্মভোলা মহাপুরুষের প্রেমিকা হিসেবে উক্ত রাজ্যেরই সন্নিহিত শৈলপ্রদেশে পাঠিয়েছেন, প্রেমপর্বের প্রস্তুতির জন্যে। তাই আমাদের এখন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু এখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। এই সময়ে কামনার বীজ অঙ্কুরিত হতে চায় না। তাই দেববৃন্দের অন্যতম পুষ্পবান-বিলাসী মদনদেবের সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। মদনদেবের কাজ হবে আত্মভোলা ভোলানাথের তপোবনে অকাল-বসন্তের সমাগম করা ও তুষারকন্যার সঙ্গে ভোলানাথের দেহগত কামনার উন্মেষ ঘটানো। অকাল-বসন্তের সমাগমে, প্রাকৃতিক সজ্জার খরচ— ধনপতি সব যোগান দেবেন।

আত্মগর্বে গর্বিত মদনদেব বললেন—হে প্রভু! এ-কাজ আমার পক্ষে কোন গুরুতর ঘটনাই নয়। আমার সহধর্মিণী রতি দেবী ও বাল্য-সখা বসন্ত যতক্ষণ আমার কাছে থাকবে, আমি যে-কোন জিতেন্দ্রিয়ের স্খলন ঘটিয়ে দিতে সক্ষম। প্রভু,—আপনি তো জানেন, আমি বিশ্বা-মিত্রের ধ্যান ভেঙে দিয়েছিলাম। ব্যাসদেবের কামলীলার স্ফুরণ ঘটিয়ে-

ছিলাম। এমনকি বিশ্বপালের কন্যা সরস্বতীর সঙ্গেও পিতা-কন্যার মধ্যে কামনার সম্পর্ক তৈরি করেছিলাম। সুতরাং সেই ব্যক্তি যিনি দেব-পরিষদের সভ্য নন তাঁকে বশ করা আমার পক্ষে কোন ব্যাপারই নয়। মদনদেবের এই কথায় সবাই সন্তুষ্ট হ'ল। কিন্তু বাক্‌পতি বললেন, দেখ মদনদেব তোমার এই আপাত লম্ফন, কার্যসিদ্ধির লক্ষণ বিরোধী। বিশ্ব-পালের কন্যা সরস্বতীর পিতা-কন্যার কামনা সম্পর্ক তৈরি করেছো সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে আরেকটি ঘটনাও ঘটেছিলো—যেটা তুমি জানো না। যথা সময়ে বিশ্বপালের ভবিষ্যৎ বাণী ফলবে। এখন যে কাজে নিযুক্ত হয়েছো সেটা অতি সন্তর্পণে, ধীরে অনুত্তেজিতভাবে করতে চেষ্টা করো।

সভার মূল কর্মসূচী ঘোষিত হয়ে গেল। গুপ্তচর হিসেবে নিযুক্ত হলেন মদনদেব। রতিপতির কাজ—ভোলানাথের সাধনাশ্রমে, অকাল বসন্তের আহ্বানে, তাঁর ধ্যানভঙ্গের উদ্দেশ্যে—যাতে তুষারকন্যা ভোলা-নাথের কামসাথী হতে পারে।

গিরি-নির্ঝরিণী-স্নাত শিলাময় ধ্যানগম্ভীর, নিদাঘতপ্ত ভোলানাথের তপোবনে, স্থিতধী-স্থানু শম্ভু ধ্যানমগ্ন। অদূরে শিব-সহচর নন্দী-ভৃঙ্গী, তপস্যার নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত।

তিন

জগৎ কারণ-কূটের অবিদ্যা সেই তপোবনে প্রবেশের অনধিকারে লজ্জিতা ও অপসৃতা। স্বয়ং পতঞ্জলির "সমাধিপাদ"কেও যেন হার মানিয়েছে এই শিব-সাধন ক্ষেত্রের নীরাজন-নিসর্গ স্বর্গভূমি। আর সেই তপোবনের প্রান্ত-প্রদেশে, প্রবেশোদ্যতা তুষারকন্যা অভিসারিকার রূপে উপস্থিত। জাতিস্মরতার বেদনায় শিবহীন-যজ্ঞের অতৃপ্ত-প্রেমের চরিতার্থ-তার মানসে। সকাম প্রেম ও নিষ্কাম মুক্তির বিপরীতমুখী সমাবেশ, তপোবনের আরেক প্রান্তে দেখা দিল,—পরিকল্পিত দৈব-চক্রান্তের আর এক ধূম্রচ্ছায়া। ধীরে ধীরে পেলব-কামের ব্যাকুল-বিরহ-দহন-জ্বালা, বিজয় তপোবনে সংক্রামিত হতে লাগলো। তুষারকন্যা হৃদয়-মনে পুষ্প-সায়কের উদ্দীপিত-কামজ্বর জ্বালা অনুভব করতে লাগলেন। দূর-দূরান্তে শৈল-প্রদেশের প্রতিঘাতী, কোকিলের কুহুধ্বনি, ভ্রমরের গুঞ্জন—পুষ্প-

রেণু প্রতিদানের পালায় মুখরিত হয়ে উঠলো। মদনদেবের মাদকীয়-প্রভাবে তপোবন রূপ নিল কুঞ্জবনের মোহময় লালসায়—চিত্তবৃত্তির প্রবৃত্তি সাধনে। অকাল বসন্তের হ'ল আবির্ভাব। দ্রব্যগুণ মহাত্ম্য কে খণ্ডাবে। প্রকৃতির প্রতুল শক্তি থাকলেও সে তো পরিণামের ব্যাপ্তি ত্রিগুণকেন্দ্রিক। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা যদি প্রকৃতি হ'ত, তবে ঋতুরঙ্গের তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখা দিত না—প্রকৃতির অঙ্গে, মানব ও দেবতার মন-বুদ্ধি-অহংকারে। তাই তো ভোলানাথের "আমি" তপোবনের অমূর্তে, আর ভোলানাথের "আমার"—কুঞ্জবনের মূর্তরূপে দেখা দিলো। দ্রব্যগুণ মাহাত্ম্যে মহাতাপসের তপোভঙ্গ হ'ল। দেবপতি কার্যসিদ্ধির প্রাথমিক সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা। ধনপতি বিজাতীয় শত্রুর হাত থেকে মুক্তি-লাভের পর, তাঁর বাণিজ্য প্রসারের দিক-নির্ণয়-ছক প্রস্তুতি করে ফেললেন। কিন্তু বাক্‌পতি! —তিনি সুপণ্ডিত। তাঁর প্রজ্ঞাময়ী চিন্তায় ইতিহাসের প্রাক্তন ঘটনা ও ভবিতব্যের আশু পরিণতির কথা ভাবতে লাগলেন।

ক্ষণ-কামাক্রান্ত মহাকাল দেখলেন, তাঁর সামনে নগ-নন্দিনী অপরূপ রূপলাবণ্যে পুষ্পস্তবক হাতে তাঁরই পদসেবায় নিয়োজিতা। স্থূলবস্তুর স্থূলে মিলন, সূক্ষ্মবস্তুর সূক্ষ্মে মিলন— এটাই অনুবাদের তাৎপর্য। সেই তাৎপর্যের ক্ষণিক আন্দোলনে, হিম-দুহিতার দেহ সৌন্দর্যের স্থূলবস্তুতে মহাতাপসের স্থূল দেহগত মিলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ হওয়ায় মুহূর্তেই, মোহভঙ্গে হিম-দুহিতার অন্তরস্থ মাদনোত্তাপ হিম-শীতল হয়ে গেল। অকাল বসন্তের প্রয়োগকর্তা মদনদেব হলেন ভস্মীভূত। দেব পরিষদীয় রাজনীতিতে দেখা দিলো চরম বিপর্যয়। বিশ্বপালের কন্যাগামী কারণাত্মক মদনদেব মহাদেবেরে অভিশাপাগ্নিতে ভস্মে পরিণত হলেন। হিমকন্যা লজ্জায় মর্মাহতা এবং পুনরায় অভীষ্ট দেবকে পাওয়ার সংকল্পে প্রভূত কৃচ্ছ্র-সাধনে, ব্রহ্মচারিণী জীবন-যাপনে ব্যাপৃতা রইলেন। আর রতি বিলাপের বেদনার্ত পরিবেশে, মদন-সখা বসন্তের পলায়ন ও জগৎ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কামশূন্য হ'ল। ত্রিবিধ দুঃখের সীমান্ত সংঘর্ষে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে, 'বিপৎকালীন জরুরী অবস্থা' ও ব্ল্যাকআউট ঘোষিত করা হ'ল।

এখন শুরু হ'ল হিম-দুহিতা পার্বতীর অক্লান্ত তপস্যা। বল্কলবাসা, শীর্ণকায়া, আমান্যভোজী, স্বকৃদাহারী, শুদ্ধচারিণী পার্বতীর অসাধারণ সাধনা। পিতৃগৃহের নিভৃত-কন্দরে পরম তপস্যাও মোহভঙ্গের মুক্তিতে

মঙ্গলের আরাধনায় নিমগ্না। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—সাধনা-সমীক্ষার সময় উপস্থিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পদধ্বনি। নিয়মানুবর্তিতার আন্দোলনে চলে সকলের আত্মসমীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার মন্ত্র।

হঠাৎ একদিন এলেন এক দূত। ব্রহ্মচারী। পার্বতীর সেই তপস্যা-ক্ষেত্রে। নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদের পর, শুরু হ'ল ব্রহ্মচারী-দূতের মুখে শিবনিন্দা। অশুভবুদ্ধিরূপ ব্যাভিচারিতাই শিবনিন্দার উৎস। সুতরাং অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন এই ব্রহ্মচারী-দূত, আমার সাধনক্ষেত্রের অযোগ্য—এই বলে পার্বতী যখন স্থান ত্যাগ করে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছেন, তখন তাঁর দ্রুতগতিতার জন্য বক্ষদেশের বস্ত্র স্খলিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী দূত নগ-নন্দিনী পার্বতীকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মাঙ্গলিক মানস প্রেমের এক পূর্ণাঙ্গ অর্ঘ্য কে যেন তাঁর দেহ-মন থেকে গ্রহণ করে তৃপ্তির শান্তিশ্বাস ত্যাগ করলো। পার্বতী জানলেন, বুঝলেন, অনুভব করলেন এই ব্রহ্মচারী-দূতই তাঁর ইহকাল পরকালের অভীষ্ট দেব, দেবাদি-দেব মহাদেব। সেই জানা-বোঝা-অনুভববেদ্যতার মধ্যেই হর-গৌরী মিলনে তাঁরা একদেহে লীন হয়ে রচনা করলেন, কল্যাণ সুন্দরের মূর্তরূপ। উভয়ের পূর্বরাগ গৌরচন্দ্রিকা সমাপ্ত হ'ল। দানবসম্রাট বিরোধী শিবিরে মহোৎসব জেগে উঠলো। যুক্ত মোর্চার সুযোগ্য দেবসেনাপতির সাহায্য-সম্ভাবনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল।

চার

তুষারকন্যা ও ভোলানাথের পূর্বরাগ প্রাণবীজ বপন হয়ে গেল। কিন্তু শুধুমাত্র প্রণয় তো মিলনের শেষ কথা নয়। প্রণয় মিলনের উৎস, কিন্তু মিলনের মোহনা তো পরিণয়ের মধ্যে নিহিত। তাই হরগৌরী মিলনের পূর্ণতা চাই পরিণয়ের মধ্যে। আর সে-পরিণয় স্বেচ্ছায়, সমাজকে না জানিয়ে করলে মদনের প্রেতাত্মা বীভৎসরূপে দেখা দিতে পারে। তাই পার্বতী সখীর দৌত্যে মহাদেব স্বীকৃত হলেন তুষারসম্রাটকে প্রস্তাব পাঠাবার জন্যে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাতটি সুবৃহৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের, সাতজন মাননীয় উপাচার্যকে আহ্বান জানানো হ'ল শিব-ক্ষেত্রের পবিত্র পরিমণ্ডলে। আহ্বায়ক, স্বয়ং ভোলানাথ। দেবাদিদেবের

আহ্বান, ভাগ্যের মাহেন্দ্রযোগ—পদোন্নতির অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ ও তাঁর দর্শনলাভ শতবর্ষের পুণ্যস্বরূপ। সেই সুখকর আহ্বান পেয়ে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন মহাপ্রাজ্ঞ, ঋষিতুল্য গবেষক উপাচার্য কাল-বিলম্ব না করে উপস্থিত হলেন শিবক্ষেত্রে। তাঁরা এসেই মহাকালকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সেরে, বস্থু স্তুতি বন্দনা করার পর জিজ্ঞাসা করলেন,—কী উদ্দেশ্যে মহাচার্য তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন! মহাচার্য রুদ্র তাঁর বজ্রগম্ভীর বাঙ্ময়ী বাণীর যথাযথ সুর বজায় রেখে বললেন—হে উপাচার্যগণ! তোমরা সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষক, প্রজ্ঞাময় নিরলস কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তোমাদের দিনাতিপাত করতে হয়। উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে দেব জনসাধারণ তোমাদের মান্য করে। তোমরা লঘু গুরু ভেদে যাকে যা আদেশ ও উপদেশ কর, সকলেই তা মান্য ও গ্রহণ করে। সেই কারণেই তোমাদের আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আহ্বান জানিয়েছি। অবশ্য এই ব্যাপারটি আমার ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, দেব-জনসাধরণের স্বার্থেই ঘটতে চলেছে। দেবতাদের ইচ্ছে, আমি হিমালয়কন্যা পার্বতীকে বিবাহ করি। এই পরিণয় মিলনের মধ্য দিয়ে যে কুমার সম্ভব হবে—সেই দেব-সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে দানবসম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় জয়লাভ করবে। অতএব তোমরা আমার এই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিরিরাজ হিমালয়কে কন্যাদানের অনুরোধে, প্রস্তাবকের ভূমিকা পালন কর।

উপাচার্যগণ গিরিশের মঙ্গলময় কথা শুনে ও তাঁদের উপর প্রস্তাবকের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে দেখে নিরতিশয় আনন্দিত চিত্তে মহাচার্যকে প্রণাম জানিয়ে বিমান যোগে তুষার-সাম্রাজ্যের অভিমুখে রওনা হলেন। অনন্ত-কালের অনন্তপ্রসারী তুষার-সাম্রাজ্যের সম্রাট মহীয়ান শিলাময় হিমালয় সম্মানিত সপ্ত উপাচার্যকে তাঁর অতিথি হিসাবে দেখে আনন্দে, সম্মানে, গৌরবে সেই মহাপ্রাজ্ঞ উপাচার্যবৃন্দকে যথাশাস্ত্রীয় বন্দনা করলেন ও জানতে চাইলেন—তাঁদের শুভাগমনের হেতু কি?—উপাচার্যগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, অগ্নিবিদ্যার গবেষক পণ্ডিত, বিশ্বপালের মানসপুত্র, বাক্‌পতির পিতা, 'মাতরিশ্বা'—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহামতি অঙ্গিরা উপাচার্যদিগের প্রতিনিধি হিসেবে হিমালয়কে বললেন—হে নগাধিরাজ, শুনুন। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব সকলের পূজ্য, কিন্তু দেবাদিদেবের পূজনীয় কোনও ব্যক্তি আজপর্যন্ত সৃষ্টি হয় নি। দেবতাদের মঙ্গল

বিধানের প্রয়োজনে, আপনার কন্যা পার্বতীকে দান করতে হবে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা মহাদেবের হাতে। এতে তিনটি ফল বর্তমান। প্রথমত, সকলের পূজনীয় মহাদেব আপনাকে পূজ্য-পিতা হিসেবে দেখার মধ্য দিয়ে, জগতে একমাত্র যে অংশে পূজ্য-পূজকের অভাব ছিল—সেটা দূর হবে। দ্বিতীয়ত, অদ্বিতীয় দাতাকে আপনি কন্যা দান করে, একমাত্র দাতা গ্রহীতার যে অংশে অভাব ছিল, সেটা দূর করবেন। এবং তৃতীয়ত, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই পরিণয়-মিলনে, আসুর শক্তিকে দমন করতে পারবে। মহামতি অঙ্গিরার যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব শুনে নগাধিরাজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। আর ভাবতে লাগলেন, তাঁর সৌভাগ্যের কথা। ত্বরান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—এই মিলনের শুভদিন আপনারা কবে স্থির করতে চান? অঙ্গিরা বললেন—আর তিন দিন পরেই শুভদিন ধার্য হবে।

এই সংবাদ জানিয়ে, মহাদেব নিযুক্ত সেই কর্মব্যস্ত সপ্ত উপাচার্য যথাক্রমে অঙ্গিরা, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ ও মরীচি হিমালয়ের তুষার-সাম্রাজ্য ত্যাগ করলেন।

পাঁচ

শ্বেত-শুভ্র-পবিত্র, গঙ্গা-মন্দাকিনী-অলকানন্দা-স্নাত, সিদ্ধঋষিপূজিত, অমূল্য রত্নখচিত—গিরিরাজের হিমাচল সাম্রাজ্য স্বতস্ফূর্তভাবেই সদাসজ্জিত থাকে। তার উপর আবার তদীয়-তনয়া পার্বতীর বিবাহ-পর্ব। তাই তুষার-সাম্রাজ্যকে মোহময়ী বৈভবে সাজানো হচ্ছে। স্বয়ং বিশ্বকর্মার নেতৃত্বে অগণিত শিল্পীর সৌন্দর্যের বিপুল মহিমায় সাজানো হচ্ছে, মণিময় আলোকমালা শিখর হতে শিখরে। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে সাজো সাজো রবের উদ্দীপনায় মুখরিত। গিরিরাজের একমাত্র পুত্র মৈনাক প্রস্তুত হয়েছেন বরানুগামিদের অভ্যর্থনার জন্য। আর ওদিকে—ধনপতির সাম্রাজ্যে অফুরন্ত সাজসজ্জার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং ধনপতি। কৈলাসে আজ বহু সম্মানিত ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছে। মহাকালের বিবাহ তাই ত্রিকালের সকল যুগন্ধর দ্রষ্টারা আজ ধনপতির সাম্রাজ্যে সপরিবার সমুপস্থিত। স্বয়ং বিশ্বপাল বরকর্তা। বরানুগামী হিসেবে প্রস্তুত হয়েছেন—সেই সাতজন উপাচার্য এবং দেবপতি বাক্‌পতি ধনপতি। স্ত্রী-আচারে নিয়োজিতা—অন্যতম উপাচার্য, সূর্যবংশীয় কুলগুরু

বশিষ্ঠ দেবের পত্নী, আচার্যানী অরুন্ধতী। এই প্রধান কয়জন বরযাত্রীদের অনুগমন করবে—নন্দী, ভৃঙ্গী প্রভৃতি ভবনাথের সদাসহচরবৃন্দ।

ডমরুর নির্ঘোষে, বিষাণের শব্দ-তরঙ্গে, আকাশ বাতাসে সুরের নটছন্দে, বৃষে আরূঢ় মহেশ্বর বরবেশে যাত্রী-সহযোগে এগিয়ে চললেন হিম-সাম্রাজ্যের অভিমুখে। বিশাল তোরণের তলদেশ দিয়ে তাঁরা পোঁছোলেন হিমালয়ের দ্বারদেশে। মৈনাক এসে ভগ্নীপতি উমাপতিকে অভ্যর্থনা করলেন। মৈনাকের গর্ভধারিণী মেনকা এসে জামাতাকে করলেন বরণ। বর ও বরানুগামিদের প্রভূত আপ্যায়নে, সম্বর্ধনা জানিয়ে, স্বয়ং গিরিরাজ সকলকে অন্দরমহলে নিয়ে বসালেন। কত দেবতা, দেবর্ষি, কুলগুরু, শিক্ষক-অধ্যাপক-আচার্য-উপাচার্য,—সেই দেবতাত্মা হিমালয়ের কন্যার বিবাহ-বাসরে উপস্থিত—তা গুনে শেষ করা যায় না। পুরাণের সাংবাদিক, কাব্যের সাংবাদিক—সকলেই ব্যস্ত প্রতিটি ঘটনার তথ্য সংগ্রহের জন্য। বিরাট আয়োজন, বিরাট ধুমধাম,—মহানন্দের মর্ত্য-ধামে দৈব-সম্মেলনের বিরাট সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। যথালগ্নে—"তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক"—এই মন্ত্র উচ্চারণে করে ভোলানাথ হলেন গৌরীনাথ। সকল অতিথি-অভ্যাগত—চোব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় গ্রহণ করে আনন্দে আটখানা হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। হিমালয়—কন্যা দান করে বিরাট দাতা ও পূজনীয় হলেন। আর বিবাহের পর দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে গৌরীনাথ, শৈলপ্রদেশের বিভিন্ন শিখরে উত্তেজক মধুযামিনী যাপন করলেন।

সেই ভোলানাথের তপোবনে মদনের ভস্ম কঙ্কালে প্রাণ ফিরে এলো। যথাস্থানে মাংস-মজ্জা-রক্ত, মন-হৃদয়-প্রেম-কাম—সব ফিরে আসতে লাগলো। যথানিয়মে এলো বসন্ত। ব্রহ্মাণ্ড থেকে কামের ব্ল্যাকআউট প্রত্যাহৃত হ'ল। বিলাপময়ী রতি দেবী কামসজ্জায় বিলাসময়ী হলেন। মদনদেব বহুকাল পর রতিকে কাছে পেয়ে বাসনার পারমিতায় জড়িয়ে ধরে এক দেহ হয়ে গেলেন। সমগ্র বিশ্ব, কুসুম সায়কের পরাগ বিদ্ধ হয়ে মধুময় হয়ে উঠলো—ভাব ও ভাষায় হর গৌরী মিলনে বিশ্বের প্রজ্ঞাকীর্তি সাহিত্যের ফল লাভ করলো।

বিশ্বপালের পরামর্শে, দেবপতির নির্দেশে দেব-পরিষদীয় রাজনীতিটা খুব একটা দুর্বল হয় নি। আর যে মহাকবি এই দেব-সেনাপতির সম্ভা-

বনার মহাকাব্যটি সম্ভব করলেন, তিনি মানসরাজ্যের ইতিহাসকে কত সুমহান সম্ভাবনার যে প্রয়োগ করতে পেরেছেনই, তার প্রমাণ শকুন্তলার অঙ্কে অঙ্কে, রঘুর সর্গে সর্গেই বিদ্যমান।

দেবরাজের স্বজনপোষণ : উৎকোচ—উর্বশী

দেবরাজ ইন্দ্রের পরম সুহৃদ, হিতাকাঙ্ক্ষী ও স্বজন—প্রতিষ্ঠান-নগরীর (বর্তমানের প্রয়াগ) অধিপতি পুরূরবা শৌর্য, বীর্য ও মহত্ত্বে ছিলেন অদ্বিতীয় পুরুষ। পুরূরবার বীরত্ব ও বিক্রমে পরম আনন্দিত দেবরাজ ইন্দ্র, স্বেচ্ছায় বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। কারণ—অসুর-নিধনে বীর পুরূরবার সাহায্য লাভ। বহুবার দেবাসুরের সংগ্রাম হয়ে গেছে। সেইসব সংগ্রামে প্রতিবারই দেবরাজ ইন্দ্র পুরূরবার কাছ থেকে সসৈন্য সাহায্য লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের যে-কোন সংগ্রামে মহারাজ পুরূরবা দেবরাজ ইন্দ্রকে সাহায্য করবেন—সে-বিষয়ে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। স্বার্থ—শুধু প্রগাঢ় বন্ধুত্বের নিরবচ্ছিন্ন নিদর্শন সৃষ্টি। এই সূত্রে অমরাবতী ও প্রতিষ্ঠাননগরীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও গড়ে উঠেছিল।

মহারাজ পুরূরবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তীব্র সংগ্রাম-সহিষ্ণুতার মধ্যেও বিষ্ণুপূজার বিরতি ছিল না কোনদিন। এ ছাড়া প্রাত্যহিক সূর্য-উপাসনাও ছিল তাঁর ধর্মভীরুতার আরেক অঙ্গ। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন পরম পত্নীপ্রিয়। পাটরানী-মহারানী ঔশীনরী, প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন তাঁর পতি, প্রতিষ্ঠানাধিপতি পুরূরবাকে। পুরূরবার সুখ তাঁর সুখ, পুরূরবার দুঃখ তাঁর দুঃখ। ঔশীনরীর হৃদয়ে অনির্বাণ প্রেম-শিখার একমাত্র ছায়া, মহারাজ পুরূরবা। নিবৃত্তির এক চরিত্রায়িত প্রতিমূর্তি মহারানী ঔশীনরী।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর স্বর্গরাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে সব সময়েই ব্যস্ত থাকেন। এই ব্যস্ততা নানাদিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে থাকে নানা সময়ে। দেববৃন্দের সংযম-শিক্ষায়, কোন কোন দেবতার ঈর্ষাদমনে, কারুর বা দৌত্য প্রয়োগ-পরিকল্পনায়। তবু দেবরাজের মনে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করে না কোন সময়। তিনি মহারাজ দুষ্মন্তের সাহায্য লাভে তৃপ্ত। মহারাজ পুরঞ্জয়ের সাহচর্যে গর্বিত। মহারাজ পুরূরবা তো তাঁর পরম সুহৃদ ও স্বজন। তবু কেন তাঁর মনে শান্তি নেই? তাই একদিন

প্রত্যূষে দেবরাজ তাঁর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ মহামাত্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। সব রকমের আনন্দ, প্রশান্তি বৈভবময়তার কথা বলার পর ইন্দ্র জানালেন—তাঁর অখণ্ড শান্তির অভাবটা কোথায়!

ত্রি-দেবতার অন্যতম প্রধান, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মহামাত্য, সদা-সাগরশায়ী বিষ্ণু বললেন—কোন চিন্তার কারণ নেই দেবরাজ! আমি এমন একটি বস্তুর সৃষ্টি করব যা দিয়ে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত চারিবর্ণ—তথা যে-কোন মহর্ষি-মুনি পুঙ্গবকে পর্যন্ত আপনি অনায়াসে ধরাশায়ী করতে পারবেন। আনন্দিত হলেন দেবরাজ। জানতে চাইলেন কি সেই অনর্ঘ বস্তু, যা দিয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যাগমনকে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? বিষ্ণু স্মিতহাস্যে অতি ধীরে বললেন—সেই বস্তুর তো এখনও সৃষ্টিই হয় নি। তবে দেখুন, আমি আপনার রাজত্বরক্ষার প্রকল্পে ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রণাশে এই মুহূর্তে সেই বস্তুটির সৃষ্টি করছি।

বিষ্ণু স্বেচ্ছায় রেতঃস্খলন করলেন। ঊর্ধ্ব দিকে তুলে দিলেন তাঁর ঊরু। ঊরুর উপর হ'ল বিষ্ণুর রেতঃপাত। বিষ্ণুর ঊরু ভেদ করে জন্ম নিল আদিরসের এক সর্বোত্তমা প্রতীক। অনন্তজন্ম যৌবনা—'নন্দন-বাসিনী' —'অপূর্ব শোভনা'—'বিলোলহিল্লোল'—'ভুবনমোহিনী'—'নিষ্ঠুরা বধিরা'—'অবন্ধনা'—'অস্তাচলবাসিনী' উর্বশী।

দেবরাজ ইন্দ্র বিস্ময়াভিভূত হয়ে একদৃষ্টে দেখলেন 'অনবগুণ্ঠিতা'—'অকুণ্ঠিতা'—উর্বশীকে। শৈশব-বালিকা-বর্জিতা, সুরেন্দ্রবন্দিতা, নগ্নকান্তি জাত-যৌবনা উর্বশীকে দেখে বিহ্বল হয়ে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বিষ্ণুর কাছে জানতে চাইলেন—তারপর? বিষ্ণুর আবার স্মিতহাস্য ফুটে উঠল। বললেন—এই নিন রূপসী উর্বশীকে। বিপদ মুহূর্তের শেষ সায়ক হিসেবে একে নিক্ষেপ করবেন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। আমার ঊরুদেশ থেকে জাত বলেই, এ শুধু উর্বশী নয়! এর নামের আরেকটি সার্থকতা আছে। 'ঊরু' কথার আরেক অর্থ, মহা-পুরুষ। তাই যে-কোন মহাপুরুষকে বশ করে তাঁর স্খলন ঘটিয়ে দিতে পারবে "আদিম বসন্ত প্রাতে"র এই সুরকামিনী উর্বশী। একে সঙ্গে নিয়ে আপনি কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন। বিষ্ণুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে উর্বশীকে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র রওনা হলেন সুর-লোকের অভিমুখে।

কার্যসিদ্ধির অমোঘঅস্ত্র শৃঙ্গারের প্রস্রবণ। শৃঙ্গারের অব্যর্থ হাতিয়ার উর্বশী। দেবরাজের যাত্রাপথে নিষ্কণ্টক সারল্য, উর্বশীর তরল-গতিতে দুর্বার। সুরপতির নিদ্রার বাতাস উর্বশীর কার্যকলাপে স্থিতি লাভ করল।

কৈলাশাধিপতি ধনকুবের, ইন্দ্রের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। একেও তো দমন করতে হবে। তাই উর্বশীর যাত্রা হ'ল শুরু কৈলাশের দিকে। উর্বশীর দেহবল্লরীর মল্লার শুরু হয়ে গেল নৃত্যের তালে তালে, কুবেরের নয়ন-পথে। কুবের প্রলুব্ধ। বশীকরণের মন্ত্রগুপ্তি উর্বশীর আহ্লাদে কুবের অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। উর্বশী প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল কুবেরের কাছ থেকে। আর সে দেবরাজের বিরোধিতা করবে না। মূল-কার্যে সিদ্ধিলাভ করে ফিরে আসছে উর্বশী। সঙ্গে তার কয়েকজন সখী —রম্ভা, চিত্রলেখা, মেনকা। সময়—সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কাল।

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে প্রতিষ্ঠানাধিপতি পুরূরবা এসেছেন সূর্য-উপাসনা করতে। স্নান সেরে সূর্যপ্রণাম করেছেন। অকস্মাৎ শুনতে পেলেন আর্তস্বর। স্ত্রীলোকের আর্তকণ্ঠস্বর—বাঁচাও, বাঁচাও—কে আছো বাঁচাও!—বীর পুরূরবা সেই ললনার আর্তকণ্ঠস্বর শুনে ছুটে গেলেন সেই দিকে। শুনলেন,—সুরলোক নর্তকী উর্বশী, কেশীদানবের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বীর বিক্রমে ইন্দ্রসখা মহারাজ পুরূরবা কেশীদানবকে হত্যা করে উর্বশীকে উদ্ধার করলেন। এই বার্তা ইন্দ্রের কর্ণগোচর হ'ল। ইন্দ্র আরও প্রীত হলেন। বন্ধুত্বের শর্তে তুলাদণ্ডের ওজন যেন আপনা থেকেই বেড়ে গেল।

কেশীদানবের আক্রমণে পর্যুদস্ত উর্বশী-উদ্ধার, এক জিনিস, আর —মদন-শরে আক্রান্ত উর্বশী-উদ্ধার সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। প্রেমলীলা-লাম্পট্যের উচ্ছল তরঙ্গ উর্বশীর দেহে মনে একাকার হয়ে আছে। উদ্ধারকর্তা পুরূরবাকে দেখে উর্বশী হতচকিতা, বিহ্বলা হয়ে গেল। বড় চুপিসারে আসে এই আদিরসের অন্তঃসালিলাধারা। তবু এই ধারা বড় অমোঘ। তার উপর আবার উর্বশী! শুধু উরু ভেদ করে জাত নয়—'উরু' অর্থাৎ মহাপুরুষকেও বশ করে তাঁর স্খলন ঘটিয়ে দিতে সমর্থ এই উর্বশী। হায় উর্বশী! তুমি সৌন্দর্যের প্রতীক না কামনার প্রতীক! বিশ্বের সব-কিছু সুন্দরতম বস্তুর সম্মিলনে বিষ্ণুর দেহে সম্ভব, অযোনি-সম্ভবা উর্বশী। জন্ম-যৌবনা উর্বশী তুমি সুন্দরী না কামনাময়ী?—এই

প্রশ্ন পুরূরবাকে মহত্ত্বের আসন থেকে, ঔদার্যের আসন থেকে, পাটরানী ঔশীনরী-গত প্রাণের আসন থেকে নামিয়ে নিয়ে এল অমোঘ শৃঙ্গার রসের নিম্নগামী প্লাবন-প্রবাহে।

শুধু ইন্দ্রই এ-ব্যাপার জানলেন, তা নয়। মহারানী ঔশীনরীও জানতে পারলেন সব-কিছু। তবু ঔশীনরী পতিপ্রাণা। পতির সুখে সুখী, দুঃখে দুখী। ঔশীনরীর হৃদয়ে অনির্বাণ প্রেমশিখার একমাত্র ছায়া পুরূরবা, তাই পুরূরবার সুখ-শান্তিতে যেন তিনি অন্তরায় না হন তার জন্যে চন্দ্রের উদ্দেশে পুজো করলেন। চন্দ্রদেবতাকে জানালেন,—আমার পতি যাকে নিয়ে সুখে থাকতে পারেন থাকুন—এতে আমার যেন কোন মনস্তাপ না হয়। নিবৃত্তির এক উদার উদাহরণ ঔশীনরী। প্রাচীন সাহিত্যে—'উপেক্ষিতা' মহারানী ঔশীনরী কল্যাণের প্রতীক।

আর উর্বশী!

পুরূরবা উর্বশী-গত প্রাণ। দ্রব্যগুণের অনিবার্য ফলশ্রুতি। পুরূরবা এখন উর্বশীর ছায়ামাত্র। ভুলে গেছেন ঔশীনরীকে। ভুলে গেছেন রাজ্য-পরিচালনার ক্ষাত্রধর্মকে।

স্বর্গসভায় নাট্যোৎসব।

আদি নাট্যকার ভরত মুনির নাটক "লক্ষ্মীর স্বয়ংবর" অভিনীত হবে। লক্ষ্মীর ভূমিকায় স্বয়ং উর্বশী। ডাক পড়েছে উর্বশীর। কিন্তু সে তো এখন পুরূরবার কণ্ঠলগ্না। তবু যেতে হয়—স্বর্গবেশ্যার কর্তব্য পালনে। হায়! নাট্যোৎসবে সমবেত দেবতার সামনে সংলাপে ভ্রান্তি! "পুরুষোত্তম" নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে "পুরূরবা" নাম উচ্চারণ হয়ে গেল। নাট্যকার ভরত মুনি ক্ষুব্ধ হলেন। অভিশাপ দিলেন উর্বশীকে —তুমি স্বর্গভ্রষ্টা হও!

এটাই তো ছিল পরিকল্পিত ব্যবস্থা। দেবরাজের নির্দেশনা। এক-মাত্র সহযোদ্ধা বীর পুরূরবাকে হাতে রাখার জন্যে উৎকোচ হিসেবে উর্বশীকে প্রেরণ। উর্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হয়ে পুরূরবার কাছে ফিরে এল। অভি-শাপ মোচনের শর্ত ছিল—পুরূরবা উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রমুখ দর্শন করলে উর্বশী আবার স্বর্গে ফিরে আসবে।

পুরূরবার সঙ্গে বারংবার দেহমিলনে উর্বশী হ'ল অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু যেদিন সে প্রসবিত হ'ল সেদিন মহারাজ পুরূরবাকে না জানিয়ে সদ্যোজাত পুত্রকে গোপনে চ্যবন মুনির আশ্রমে আর্যা সত্যবতীর কাছে পাঠিয়ে

দিল। কারণ মহারাজ পুত্রমুখ দর্শন করলে আবার মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গে চলে যেতে হবে উর্বশীকে। গণিকা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই মাতৃত্ব থেকে প্রিয় সহচরের সান্নিধ্য অক্ষুণ্ণ রাখা। —এটাও কি ইন্দ্রের নির্দেশ নয়?

পুরূরবা সাম্রাজ্যের দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে সম্ভোগের প্রমোদ-কানন গন্ধমাদন পর্বতের উপবনে উর্বশীকে নিয়ে চলে গেলেন মধুযামিনী যাপন করতে। ঔশীনরী পুরূরবার ছায়াকে নিয়ে অশ্রুর উপকরণে প্রেমের পুজো করতে লাগলেন। গন্ধমাদনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস উর্বশীকে নিয়ে মহারাজ ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে উর্বশীর ছায়াসর্বস্ব প্রাণ হয়ে গণিকার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যে পরিণত হলেন।

একদিন গন্ধমাদনের পাহাড়ী ঝর্নায় একটি কিশোরী নগ্নদেহে স্নান করছিল। নাম তার উদয়বতী। গ্রাম্য পাহাড়ী মেয়েকে দেখে রাজা বিহ্বল হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উর্বশী ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে নিজের সর্বনাশ ঘটাবার জন্যেই 'কার্ত্তিক বনে' প্রবেশ করল। কার্ত্তিক বনে নারীর প্রবেশাধিকার নেই। তাই অদৃষ্টের পরিহাসে উর্বশী একটি লতায় পরিণত হয়ে গেল। এটাও উর্বশীর ভাগ্যের অভিশাপ। এরপর শুরু হ'ল পুরূরবার বিলাপ। প্রিয়ার বিয়োগ-বিধুর যন্ত্রণায় পুরূরবার উন্মত্ত বিলাপ। অবশেষে দৈবী-পরিকল্পনার সৌজন্যে পুরূরবার পুনরায় উর্বশী লাভ।

কিন্তু উর্বশী তো মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়! সে তো শুধু কামনা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। সে শুধু নিছক নারী—শুধু মোহিনী—রসপিপাসু স্বর্গের নর্তকী—কিংবদন্তীর গণিকা! তবে কেন ইন্দ্রের বা দেবতাদের নব-বিধানের সূচনা! তবে কেন অভিশাপের পর উর্বশীর গর্ভজাত পুত্র চ্যবন মুনির আশ্রম থেকে ফিরে পুরূরবাকে পিতারূপে বরণ করে; আর পুরূরবাও বাৎসল্যরসে অভিভূত হয়ে পড়েন। আর তার পরেও, পুত্র-মুখ দর্শন সত্ত্বেও উর্বশীর প্রতি ভরত মুনির অভিশাপ কার্যকরী না হয়ে—যতদিন পুরূরবা জীবিত থাকবেন, ততদিন উর্বশী তাঁর কণ্ঠলগ্না হয়ে স্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবে—এই বিধান কেন বলবৎ হয়?

কারণ, পুরূরবা বীর সংগ্রামী, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবরাজের প্রধান সহযোদ্ধা। তাই তো দেবরাজের স্বজনপোষণ উর্বশীকে উৎকোচ হিসেবে দান। মহাকবি কালিদাসের নাটক "বিক্রমোর্বশীয়ম্"-এর অঙ্কে অঙ্কে দেবতাদের স্বজনপোষণের রাজনীতি, রমণীর রমণীয় উৎকোচ দান-গ্রহণের মধ্যে সোচ্চার হয়েছে। কালিদাসের এই ভাবনাটিকে কোন সমলোচকই দেবতা ও রাজন্যের কুটিল রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে তুলে ধরেন নি।

চক্রবাকের প্রেম

'প্রেম' কথাটার সঙ্গে সাহিত্য ও দর্শনের একটা নিবিড়-নিকট সম্পর্ক আছে। সাহিত্যের প্রেমে অনেক নিঃস্বার্থ দান-প্রতিদান চলার পর শেষ স্তরে সেটা দৈহিক পর্যায়ে চলে যায়। তখন সেটার নাম প্রেম থাকলেও, তত্ত্বের দিক থেকে কার্যত পরিণত হয় কামে। তাই সাহিত্যে প্রেম, সব সময়েই সকাম। সাহিত্যের প্রেম যেমন কামের দিকে এগোয়, পক্ষান্তরে দর্শন, কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের পথ দেখায়। তাই দার্শনিকরা নিষ্কাম-প্রেমকেই মান্য করে থাকেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে-প্রেমের কথা বলব, সেই প্রেম সাহিত্যের প্রসঙ্গে বারবার উল্লিখিত হলেও এর মধ্যে সকাম বা নিষ্কাম এ-দুটির কোন প্রেমই ঠিক প্রযুক্ত হয় নি। তবু এই প্রেম শুধু মহান বললে ভুল হবে—এই প্রেম মহত্তম। এই প্রেম, বিরহের আগুনে পরীক্ষিত। চিরকালের 'যুক্ত-বিযুক্তের' অভিজ্ঞতায় এক দ্বান্দ্বিক-বৃত্তে ঘূর্ণায়মান। তাই বিশিষ্ট কবিরা মহত্তম প্রেমের উপমায় নিরূপায় হয়ে এই নির্দিষ্ট পাখির প্রেমটিকে তাঁদের কাব্যে বার-বার স্থান দিয়েছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর প্রায় সব কাব্য-নাটকেই মহত্তম প্রেমের উপমায় চক্রবাক পাখির প্রেমকে স্থান দিয়ে প্রেম ও বিরহের এক অপূর্ব পরিবেশ রচনা করেছেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যের অঙ্গনে এ-পাখির বিচরণ প্রথম। সংস্কৃত-সাহিত্যের বিশিষ্ট কবিরা, যেমন—ভাস, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘের মতো জনপ্রিয় কবিদের কাছে এই পাখির অবতারণা বহুক্ষেত্রে বহুবার হয়েছে। উক্ত সাহিত্যে এই পাখির 'বাচ্যাতিশায়ী' নাম, "রথাঙ্গনামা"। প্রকৃতপক্ষে এই পাখি চক্রবাক নামে পরিচিত। রথের একটি অঙ্গ বা অংশ হচ্ছে 'চক্র' বা চাকা। তাই চক্রবাক পাখিকে বাক্‌সিদ্ধ কবিরা "রথাঙ্গনামা" বলে অভিহিত করেন। এই রথাঙ্গনামা বা চক্রবাক পাখির প্রেম, সাহিত্যের এক উপজীব্য বিষয়। নায়ক-নায়িকার চির-বিরহের উপমায়, চক্রবাক-মিথুনের বিরহের উদাহরণটি তাই কবিদের

কাম্য উপাদান হিসাবে স্বীকৃত। চক্রবাক-মিথুনের প্রেম-প্রয়োগটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং অপেক্ষাকৃত মহান বললেও অতিরঞ্জিত কিছু হবে না।

চক্রবাকের প্রেম সূর্য-সাক্ষ্যের পবিত্রতায় উজ্জ্বল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই বিহঙ্গ-যুগলের প্রেমলীলা অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড ও আন্তরিকতার গভীরতম প্রদেশ থেকে পরিপালিত। সূর্যাস্তের মুহূর্তে কুলায়-গামী পক্ষিকুল দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে ঠিকই, তবু মিথুন-সাযুজ্যলাভ থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু চক্রবাকের ইতিহাস, স্বাতন্ত্র্যের সৌন্দর্যে মহত্তর। এটা বোধহয় সারাদিনের অবিশ্রান্ত প্রেমেরই এক শাস্তি। তাই সন্ধ্যার আলোকহীন পরিবেশে চক্রবাকের মনে নিরানন্দ নেমে আসে কান্তা-বিয়োগের নিদারুণ ব্যথায়। বৃক্ষশাখার নীড়ে-নীড়ে চক্রবাকের দৃষ্টিহীন ক্রন্দন সারারাত্রির অন্ধকারকে বেদনায় ভরিয়ে তোলে নির্মমভাবে। পাখির ভাষা মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু যাঁরা পক্ষিতত্ত্ববিদ্ তাঁরা পাখির ভাষা প্রত্যক্ষভাবে না-বুঝলেও, পাখির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মেলামেশার মধ্য দিয়ে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাতে পাখি কী বলতে চায়, করতে চায় তার একটা পরোক্ষ ধারণা করে নিতে পারেন। সেই ধারণাটা কিন্তু অমূলক নয়। সেই ধারণা থেকে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌রা বুঝেছেন—বিনিদ্র-রজনীর তপ্ত-করুণ ক্রন্দন নিশি-চক্রবাকের হৃদয়-যন্ত্রণাকে একটা আকুল আবেদনে ভরিয়া তোলে। সে চায় কান্তা-মিলন। কান্তা চায়, তার আকাঙ্ক্ষিত কান্তের সাযুজ্যলাভ। কিন্তু হয় না। নিবিড় অন্ধকারের অবিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলি তাদের অ-বিযুক্ত জীবনের অভিশাপ। তাই তাদের বিযুক্তজীবন সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত বিরহের বেদনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার পূর্বদিগন্তে সূর্যালোকের আহ্বানে চক্র-চক্রীর মিলন, প্রেম—তাদের প্রেমের সাক্ষী স্বয়ং সূর্যদেব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চক্রবাক-মিথুনের মিলন কখনও তাদের জীবনের নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত সঙ্গী ছাড়া আর অপর কারুর সঙ্গে হয় না। পর-পুরুষ বা পর-স্ত্রী গমন, এই পক্ষি-সমাজে নেই। কোন প্রাণীকুল এমনকি সভ্য সমাজের মানুষের জীবনেও প্রেমের এই আদর্শ দুর্লভ ও বিরল। কিন্তু কথা একটাই এই যে, —প্রতিদিনের দিবাভাগ ও রাত্রিভাগ চক্রবাক-মিথুনের জীবনের এক একটি যুগের সূচনা ও অবসান। প্রেম ও বিরহের দৈনন্দিন দ্বন্দ্ববৃত্তের অমোঘ-ঘূর্ণন। ওদের জীবনে, দিবসের মিলনে যতটুকু বিবাদ-বিসংবাদ বা পাপ-তাপ তার শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের

অনুভূতি নিশি-চক্রবাকের মিথুন-বিয়োগ ব্যথার অন্তর্দাহে পরিপূরক হয়ে ওঠে। তাই ওদের প্রেম স্বর্গীয়। প্রেম ও কামের ধর্মাধর্মের বিচার বিবেচনায় স্বতঃস্ফূর্ত। এইজন্যই তো কবিকুলের কাছে চক্রবাক পাখির প্রেম এত আদরণীয়। তাঁদের কাব্য-সাহিত্যের একটি অপরিহার্য সম্পদ।

রাম-সীতার বিয়ে হ'ল। মিলন হ'ল। দশরথের রাজনীতি-বিমুখতার জন্য তাঁদের বনবাসও হ'ল। বনবাসে থাকাকালীন লঙ্কাধিপতি কর্তৃক সীতা হলেন অপহৃতা। রামের জীবনে এল কান্তা-বিয়োগের নিদারুণ ব্যথা। অনেক কষ্ট ও চেষ্টায় রাম আবার সীতাকে উদ্ধার করে আকাশ-পথে পুষ্পক-বিমানে অযোধ্যার দিকে ফিরছেন। পথে তাঁরা দেখা পেলেন পম্পা-সরোবরের। সেই পম্পা-সরোবরের ওপর দিয়ে তাঁরা যখন যাচ্ছেন, তখন রাম তাঁর প্রিয় সীতাকে বললেন—"হে প্রিয়ে! আমি যখন তোমার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলাম তখন ঐ পম্পা-সরোবরের চির-সম্মিলিত চক্রবাক-মিথুনের পরস্পর পদ্মকেশর দান সতৃষ্ণ নয়নে দেখতাম।" (রঘু—১৩/৩১) উদ্ধৃতিটি রামচন্দ্রকে দিয়ে বলাচ্ছেন, মহাকবি কালিদাস। কাব্যে কী সুন্দর 'কনট্রাস্ট'! কবি, চির-সম্মিলিত চক্রবাক প্রসঙ্গে যে-শব্দটি অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন সেটি হচ্ছে— "অবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নান্।" এই 'অবিযুক্ত' কথার সঙ্গে চক্রবাকের জীবনেতিহাসের চক্রে একটা 'বিযুক্ত'-র ইঙ্গিত আছে। যে-ইঙ্গিত রামচন্দ্রের আগামী-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রামচন্দ্র, সীতা সহযোগে অযোধ্যায় ফিরে এসে আবার রাজা হলেন। এল বাধা। প্রজারঞ্জনের তাগিদে মূর্খ জনসঙ্ঘের অনুরোধ রক্ষায় সীতা হলেন আবার বনবাসী। রামের জীবন শূন্য। কালিদাসের শব্দচয়নের কী মুন্সীয়ানা! নিশি-চক্রবাকের বিরহ আর দিনের আলোয় চক্রবাকের মিলনের সঙ্গে রাম-সীতার জীবনের কী অপূর্ব মিল। এই মিল-অমিলের বৈপরীত্যে রাম-সীতার চিরস্থায়ী প্রেম কি, চক্রবাক পাখির প্রেমের সঙ্গে কোন অংশে ভিন্ন? কখনই না।

'কুমারসম্ভব'-এ চক্রবাক-মিথুনের প্রেম-পর্বের উপমাটিও অসাধারণ বলা যেতে পারে। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে শিব ও পার্বতীর পরিণয়োত্তর কালে মধুযামিনী যাপন, হিমালয়ের গৌরীনাথ শৃঙ্গে। সন্ধ্যা-সমাসন্ন। শিব, প্রিয়তমা পার্বতীকে সন্ধ্যার বর্ণনা করছেন।

সন্ধ্যার তিনি একাধিক বর্ণনা করলেন। অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিমাভার নিঃশেষে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, মৃগ-ময়ূরের প্রত্যাগমন, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মের মুদ্রিত হওয়া, কুমুদের প্রস্ফুটন, ঋষিদের সুমধুর কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ, পৃথিবীর নিদ্রালু আচ্ছন্নতা—আরও কত কী! তারপরে শিব বললেন —"পার্বতী তুমি আমাকে মুহূর্তকালের জন্য সময় দাও, আমিও সন্ধ্যা-বন্দনা সেরে নিই"। শিবের এই কথা শুনেই পার্বতীর অভিমান হ'ল। সারাদিন ধরে শিবের অভ্যস্ত-আসঙ্গ-লিপ্সা পার্বতীকে মুগ্ধ করে রেখে-ছিল। ক্ষণিকের জন্য হলেও শিব-বিচ্ছেদ, পার্বতীর কাছে এক কষ্টকর বিরহ বিশেষ। শিব ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন—"কিং ন বেৎসি সহধর্মচারিণং চক্রবাক সমবৃত্তিমাত্মমঃ।" (কুমার—৮/৫১)—"পার্বতী তুমি শুধু শুধু রাগ কর কেন? আমি তো কিছুই করি নি। শুধু নিত্য-ক্রিয়ার অন্তর্গত সন্ধ্যাবন্দনার সময় চেয়েছি মাত্র। চক্রবাক যেমন চক্রবাকীকে ছেড়ে অন্য কোনদিকে মন দেয় না, কিন্তু তবু তো অমোঘ-বিধানের শর্তেই সেই চক্রবাক কখনো কখনো চক্রবাকীকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। তাবলে কি চক্রবাক, অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয়? আমি তোমারই সহধর্মচারী। আমি অনন্য পরতন্ত্র। চক্রবাকের প্রেমের সঙ্গে আমার প্রেমের অমিল নেই।"

সন্ধ্যাবর্ণনার মুহূর্তে কবি, শিবের মুখ দিয়ে তাঁর অনন্য পরতন্ত্রতার উপমায় সামান্য এক পাখির প্রেমকে যেভাবে নিয়ে এসেছেন, তা সত্যিই স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য।

খুব সংক্ষেপে হলেও মেঘদূতের 'উত্তরমেঘ'-পর্বে কালিদাস, যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বিরহের উপমায় চক্রবাকের প্রেমকে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন। কবি-প্রেরিত মেঘ, অলকায় পৌঁছে অলকাপুরীর কক্ষে যে-স্রষ্টার আদিসৃষ্টি সৌন্দর্যের চমৎকারিত্বে যক্ষপ্রিয়ার রূপ ও ভঙ্গি দেখে-ছিল, সেই ভঙ্গির মধ্যে যক্ষপ্রিয়ার বিরহ-কাতর চাঞ্চল্যে কবি শোনাচ্ছেন—

"চক্রবাকীমিবৈধকাম্।"—"স্বল্পভষিণী যক্ষপ্রিয়ার একমাত্র সঙ্গী আমি এই দূরে রামগিরির নির্জনতায় পড়ে আছি, আর চক্রবাককে হারিয়ে চক্রবাকী যেমন একাকিনী ছটফট করে, ঠিক সেইভাবেই আমার প্রিয়া নীরবে বিরহে ক্রন্দন করছে।"

চক্রবাকের প্রেমকে কালিদাস মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর বিভিন্ন রচনায় চক্রবাক-মিথুনের প্রেম-প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপন করেছেন। তাই কবির কাছে চক্রবাকের প্রেমও প্রবাদের উর্ধ্বে ঐতিহাসিক-তথ্যে অমলিন উজ্জ্বল।

রামরাজত্ব : বাল্মীকি বনাম কালিদাস

বাল্মীকির রামায়ণকে অবলম্বন করে সংস্কৃত সাহিত্যে যেসব কাব্য-নাটক রচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্য নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে বাল্মীকি-ব্যাসের পর কালিদাস যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ঠিক তেমনই রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী যুগের সর্বোত্তম মহাকাব্য রঘুবংশ। বাল্মীকি•রামায়ণ অবলম্বন করে এই রঘুবংশ রচিত হলেও, কালিদাস কোথাও আদি কবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন নি। যেখানে বাল্মীকি দীর্ঘ ও বিস্তৃত বর্ণনায় রামায়ণের কাহিনী পরিবেশন করেছেন, সেখানে কালিদাস স্বভাব-সিদ্ধভাবেই নীরব থেকেছেন। আর যেখানে বাল্মীকি শুধুমাত্র পেলব-লেখনীর মৃদুস্পর্শে কোন বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র করেছেন, সেখানেই শিল্পীকবি, আদিকবির অবিস্তৃত পর্বে প্রবেশ করে রামায়ণকারের 'অরণ্য'কে সাজানো বাগানে পরিণত করেছেন। সেই-জন্যেই কালিদাস অননুকরণীয়।

'রামরাজত্ব' কথাটির সঙ্গে যে লৌকিক-ভাবনা ও উচ্ছ্বাস জড়িত রয়েছে, রঘুবংশ কাব্যের মধ্যে কিন্তু তার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। রঘুবংশ পড়লে মনে হবে এই বংশের উত্তুঙ্গ গৌরবের দিন রামের রাজত্বকালে নয়, তা ছিল দিলীপ ও রঘুর রাজত্বকালে। রামের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে কিন্তু রঘুবংশের পতনের বীজও সূক্ষ্মভাবে সঞ্চরিত হয়েছে।

দশরথ-কর্তৃক রামের নির্বাসনের মধ্যে যে-অভিশাপের প্রথম ছায়া-সংকেত রঘুবংশকে স্পর্শ করেছে সেই অভিশাপই যেন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলেছে। সীতার বনবাস, সীতাহরণ, সীতার প্রথম অগ্নিপরীক্ষা, সীতার নির্বাসন, সীতার দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষার নির্দেশ, অবশেষে সীতার পাতালপ্রবেশ—এসব ঘটনাই একসূত্রে গাঁথা। আর সীতার পাতালপ্রবেশ থেকেই রঘুবংশের গৌরব-সূর্যও পাতালাভিমুখী হয়েছে।

রঘুবংশ তথা সূর্যবংশের পতনের পশ্চাতে অলোকসামান্য চরিত্রের অধিকারী রামচন্দ্রের কয়েকটি ভ্রান্তি যে সুন্দরভাবে কাজ করেছে, কবি কালিদাস অত্যন্ত শৈল্পিক-বাঙ্‌ময়তার সঙ্গেই সেগুলি দেখাতে চেয়েছেন তাঁর অমূল্য মহাকাব্য রঘুবংশে। যেগুলি রামায়ণে থাকলেও এত সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট হয় নি।

গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টট্‌ল ট্র্যাজেডির কতকগুলি সংজ্ঞ নির্ধারণ করেছেন। সব ক'টি সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করার যৌক্তিকতা নেই। শুধু একটিই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। গ্রীক দার্শনিক বলেছেন, ট্র্যাজেডির নায়ক-চরিত্রের ছিদ্রপথ দিয়ে ভ্রান্তি প্রবেশ করে এবং তাকে ঠেলে দেয় তীব্র বিয়োগ-বিধুর পরিস্থিতির দিকে। ফলে, নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় দৃঢ়-মূল হয়ে ওঠে।

মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশের একাদশ সর্গ থেকে পঞ্চদশ সর্গ পর্যন্ত রামচন্দ্রকেই প্রধান নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ; রঘুবংশের একাদশে যে রামলীলার শুভ সূচনা হয়েছিল, পঞ্চদশ সর্গে এসে কবি যেন চরম বুদ্ধিমত্তার সৌজন্যে মহানায়কের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছেন। কবির পরিকল্পিত উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মতো মহানায়ক এক সূক্ষ্ম ট্র্যাজেডির মধ্যে আবর্তিত হয়ে রঘুবংশের পতনের বীজকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

রাজ-নায়ক রাম-চরিত্রের ছিদ্রপথ দিয়ে বহুবিধ ভ্রান্তি প্রবেশের ইতিহাস, কালিদাস প্রকাশ করেছেন। এই ভ্রান্তিগুলিই রামরাজত্বের ব্যর্থতা ডেকে এনেছে। চতুর্দশ সর্গে অযোধ্যানগরীর রাজপ্রাসাদ থেকে রামচন্দ্রের কোলাহলমুখর নগর-দর্শন সময়ে অন্যতম রাজ-বয়স্য ভদ্রকে সম্বোধন করে—রাজ্যে আমার সম্বন্ধে প্রজাদের মধ্যে কি কি বিষয়ের আলোচনা হয়—এই জিজ্ঞাসাই রাম-চরিত্রের ভ্রান্তি উন্মোচনের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। কারণ, যেখানে কবি পূর্বেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,—'রাম সিংহাসনে আরোহণ করে ধর্ম-অর্থ-কাম বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হলেন, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করতে লাগলেন' (১৪/২১)।

কবি আরও জানালেন—'লোভশূন্য রামের সুব্যবস্থাগুণে রামরাজ্যে দরিদ্রেরও ধনাগম হতে লাগলো। তিনি পিতার ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। তাঁর বীর্যবত্তায় রাজ্যের সমস্ত

আপদ প্রশমিত হল। এক কথায় রামচন্দ্র পুত্রহীনের পুত্র, পিতৃ-হীনের পিতা এবং অনাথের নাথ হলেন' (১৪/২৩)। রামচন্দ্রের দয়াদাক্ষিণ্য গুণে অযোধ্যার প্রজাসাধারণ যখন এতই বিলাস-বহুল আনন্দমুখরতায় উজ্জ্বল ও তাঁর প্রতি পরমনির্ভর, তখন রামচন্দ্রের —'ভদ্রং কিংবদন্তীং প্রপচ্ছ'—এই জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজনই হয় না। এই অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাই রামের জীবনের ছিদ্রপথে ভ্রান্তির প্রথম বীজ বপনে সহায়তা করলো এবং ভদ্রের অপ্রিয় সত্যভাষণে জানকীর চরিত্রের উপর জ্ঞানহীন জনসংঘের সন্দেহে সীতা-পরিত্যাগের পরি-কল্পনাও দৃঢ়মূল হয়ে উঠল।

রামচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রান্তি—লক্ষ্মণকে দিয়ে সীতা পরিত্যাগকালে, রামচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্যকে গোপন করার মধ্যে নিহিত। স্নেহ ও প্রেমের আতিশয্যে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে উপদেশ করলেন, সীতার কোন জিজ্ঞাসার উত্তরে যেন বলা হয়—ভাগীরথী ও তপোবন দর্শনের অভিপ্রায়েই সীতা, এই নদীবেষ্টিত বিজন-বনভূমিতে আনীতা হয়েছেন।

সীতার প্রতি রামচন্দ্রের স্নেহ ও প্রেমের যদি এতই ব্যাপক প্রবাহ বিদ্যমান থাকে তবে তাঁকে প্রথমত পরিত্যাগ করাটাই অনুচিত। আর যদি প্রজারঞ্জনই রাজকীয় আদর্শের মাপকাঠি হয় তবে লক্ষ্মণকে সত্য ভাষণের উপদেশ দেওয়াটাই প্রেমের আন্তরিক নিদর্শন হতে পারত। এখানেই ট্রাজেডির সূক্ষ্মপথ ধরে মহানায়কের ভ্রান্তি অনুচ্চারিত-চরিত্রের প্রকাশ্য অস্থিরতায় পর্যবসিত হয়েছে।

রামচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রান্তি অবতারতত্ত্বকেও উপেক্ষা করেছে। এমনকি ধর্ম-বর্ণের সাম্প্রদায়িকতায় নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি যেন জড়িয়ে পড়েছেন। বালীবধ, রাবণবধের মধ্যে এক বৃহৎ স্বার্থ জড়িত ছিল। সমগ্র দেশ ও বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনে, তথা—"ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—এই শাস্ত্রীয় অবতার কর্মবাদের প্রয়োজনে বালীবধ ও রাবণবধকে অশাস্ত্রীয় বলা চলে না।

কিন্তু রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে, জাতিভেদগত সাধনার অধিকারের ক্ষেত্রে, রামচন্দ্রের শূদ্র শম্বুকহত্যা, নায়ক-চরিত্রের বিরাট ভ্রান্তি বলেই মনে হয়। রামচন্দ্র একটি দৈববাণী শুনলেন,—হে রাজন্, আপনার প্রজা-পুঞ্জের মধ্যে কোথায় যেন ধর্মবিগর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুসন্ধান করে তার প্রতিবিধার করুন!—শুরু হ'ল রামচন্দ্রের অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান করে তিনি দেখলেন—এক ব্যক্তি অধোমুখ হয়ে কঠোর তপস্যায় রত রয়েছেন (১৫/৪৯)। রামচন্দ্র জানতে পারলেন এই কঠোরতপা ব্যক্তি জাতিতে শূদ্র, নাম তার শম্বুক। ইন্দ্রপদলাভের বাসনায় তার এই কঠোর তপস্যা। শূদ্রের তপস্যায় অধিকার নেই। এ-তপস্যা যত দুষ্করই হোক না কেন, অনধিকার দোষে দুষ্ট। সুতরাং সে সদ্‌গতি লাভ করতে পারবে না (১৫/৫৩)।

তাই রামচন্দ্র অস্ত্রাঘাতে সেই শূদ্র তাপসের কণ্ঠনালী বিচ্যুত করলেন (১৫/৫২)। শম্বুক হত্যার পরেই দেখা গেল মৃত ব্রাহ্মণকুমার পুনর্জীবন লাভ করল।

কী অদ্ভুত বিচার! সমগ্র ভারতের উপাখ্যান-ইতিহাসে কী বীভৎস্য জাতি-ধর্মের অসামাজিক, অমানবিক ও অশাস্ত্রীয় চিত্র! আর সেই চিত্রের শিল্পী বিষ্ণুর অবতার রামায়ণের মহানায়ক স্বয়ং রামচন্দ্র।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একসঙ্গে চলার, বলার, উপাসনার কথা ঋক্‌-বেদের দশমমণ্ডলে ঘোষিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বমানবকে ঔপনিষদিক সুর অমৃতের পুত্ররূপে নির্দেশ করেছে। স্বয়ং কৃষ্ণ উপদেশ করেছেন, বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গরু-কুকুর-হস্তী-চণ্ডালে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারলে পণ্ডিত হওয়া যায়; রামচন্দ্রের আদিপুরুষ সূর্যবংশের প্রথম মানব স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন—সকলেই জন্মগ্রহণের দ্বারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে ধাপে ধাপে সংস্কার, কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় শাস্ত্র-সংহিতার এই উদার-বিধানের উদাহরণকে উপেক্ষা করে বা বিস্মৃত হয়ে, কঠোর সাধনারত শূদ্র শম্বুকের প্রতি রামচন্দ্রের এই অবিচারের কারণ কি!

জন্মগত অধিকার-সূত্র স্বাধীন রাজতন্ত্রের ইতিহাসে থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয় আত্মিক-সাধনার পরিমণ্ডলে আমরা তো দেখেছি হিরণ্য-কশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ জন্ম নেয়, ব্রাহ্মণত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বামিত্র কঠোর সাধনায় রত হয়। এমনকি রামায়ণকার রত্নাকর দস্যুর পাপ-স্খালনের জন্য কঠোর সাধনায় ক্রান্তদর্শী কবিক্রতু মহর্ষি-মহাকবি 'বাল্মীকি'-তে পরিণত পর্যন্তও হয়।

তবে?—ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণই হবেন এরূপ রাজতন্ত্র-ন্যায়জন্মের ইতিবৃত্ত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে তো স্বীকৃত নয়। আর সেই মৃত 'শিশু-ব্রাহ্মণ', শম্বুক হত্যার প্রতিক্রিয়ায় পুনর্জন্মলাভ করল। যে-শিশুর

এখনও সংস্কার সাধন হয় নি; যে-শিশুর এখনও কর্মসাধন হয় নি—এক কথায়, যে-শিশু দ্বিজত্ব ও বিপ্রত্বের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে, শুধু জন্মের সৌজন্যে শূদ্রত্বকে অবলম্বন করে অবস্থান করছে, সেই শিশুকে বাঁচাবার প্রয়াসে যে শূদ্র থেকে সংস্কার ও কর্মের মধ্য দিয়ে দ্বিজত্ব ও বিপ্রত্বের অঙ্গীকারে কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্বের পদে আসীন হতে চলেছেন, তাকে হত্যা করে জন্মগত অধিকারের সূত্রে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির নিখুঁত নিদর্শনকেই কি বলবান্ করা হ'ল না! বৈদিক কর্মকাণ্ডকে ও স্বায়ম্ভুব মনু বিহিত সংস্কারের অনুবর্তন করতে গিয়ে সেই রাজর্ষি ও মহর্ষিরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কত অবৈদিক ও অমানবিক কাজ করে গিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুককে উচ্চমার্গে উপনীত হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্যে কুম্ভ-যোনি মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে প্রচুর অনর্ঘ অলংকার পুরস্কারস্বরূপ দান করেছিলেন (১৫/৫৫)। রাম-চরিত্রের এই প্রবল ভ্রান্তি তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিকে যে কত শক্তিশালী করেছে, সেটা রঘুবংশের পতনের ইতিহাসের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই।

রামচন্দ্রের চতুর্থ ভ্রান্তি আরও ভয়াবহ। কারণ, এই ভ্রান্তিটি কেন্দ্রীয় রাজধানীর বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে, বীজ থেকে বৃক্ষে পরিণত হয়ে অযোধ্যার ধারাবাহিক রাজ্য-রাজনীতিতে একটা বিপুল ভাঙনের পথ খুলে দিয়েছে।

রঘুবংশের প্রথম নৃপতি দিলীপ থেকে চতুর্থ নৃপতি দশরথ পর্যন্ত কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে অযোধ্যা নগরীই চিহ্নিত হয়ে আসছিল। এক রাজার শাসনে যৌথ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে রাজ্য-রাজনীতি পরিচালিত হ'ত। কিন্তু রামচন্দ্রের রাজত্বকালে দেখা গেল সেই রাজ্য-রাজনীতি পরিবর্তিত হয়ে একনায়কতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙেচুরে রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অভ্যুদয় হ'ল। একান্নবর্তী সংসার যেন পৃথগান্নে পর্যবসিত হ'ল।

রামের পঞ্চম ভ্রান্তি লক্ষ্মণের সহোদর শত্রুঘ্ন, মধুপুত্র লবণরাক্ষসকে বধ করে মধুদৈত্যের রাজধানী যমুনাকূলে 'মধুরা' (মথুরা) নামে এক অতি মনোহর পুরী নির্মাণ করলেন। শত্রুঘ্নের সুশাসনে নবনির্মিত মধুরা

পুরীর অবস্থা দর্শনে মনে হ'ল যেন স্বর্গধামের অতিরিক্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত ঐ নতুন উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছে। কবির ভাষায়—'উপকূলং স কালিন্দ্যা পুরীং পৌরুষভূষণঃ। নির্মমে নির্মমোর্থেষু মধুরাং মধুরাকৃতি। (র-১৫/২৮)।" রামচন্দ্রের অযোধ্যায় একটি শাসনযন্ত্রের অবস্থান থাকা সত্ত্বেও শত্রুঘ্ন মধুরার অধিপতি হয়ে ভিন্নরূপে রামের ইচ্ছাতেই একটি ঔপনিবেশিক প্রাদেশিক শাসনের পত্তন করলেন। "···কৃত্বেবোপা-নিবেশতা (১৫/২৯)।"

বলাবাহুল্য, রাজতন্ত্রের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা কায়েম হলে উভয় রাজন্যের সমান্তরাল চিন্তাধারার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সুতরাং রামচন্দ্রের ছিদ্র-পথে এই ভ্রান্তি খুবই বিপজ্জনক এবং এই বিপজ্জনক ভ্রান্তি রাজনীতিতে সংক্রামক ব্যাধির মতোই বাধাহীন দুর্বল শাসনযন্ত্রে একের পর এক প্রাদেশিক শাসন গণ্ডির মধ্যে বিস্তারলাভ করে থাকে। পঞ্চদশ সর্গে সেটাই দেখা গেল।

দেখা গেল, বাল্মীকির তপোবনে সীতার সঙ্গে যমজ পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল। বাল্মীকি সেই কুমারদ্বয়কে শাস্ত্রানুসারে জাত-কর্মাদি সংস্কার করলেন (১৫/৩১)। আরও দেখা গেল, একই সময়ে অযোধ্যাতেও ত্রেতাগ্নির-ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতা স্ব-স্ব পত্নীতে দুই-দুইটি করে পুত্র উৎপাদন করলেন। চার দাশরথির মোট আটটি পুত্রলাভ হ'ল—(১৫/৩৫)। এই আট পুত্রের জন্মগ্রহণে যেরূপ ঋষি-বরের প্রয়োজন হ'ল না, আবার এই পুত্রদের রাজ্যবণ্টন ব্যাপারেও জ্যেষ্ঠানুক্রম বিবেচিত হ'ল না।

তাই পরবর্তী শ্লোকেই দেখা যাচ্ছে, জ্যেষ্ঠের দর্শনোৎসুক শত্রুঘ্ন প্রভৃত জ্ঞানসম্পন্ন শত্রুঘাতী নামক পুত্রকে মথুরায় এবং অপর পুত্র সুবাহুকে বিদিশায় প্রতিষ্ঠিত করলেন (১৫/৩৬)। শুধু তাই নয়, প্রজাপালক রামচন্দ্র ভরত-মাতুল যুধাজিতের পরামর্শে ভরতকে সিন্ধু নামক প্রদেশের রাজ্যভার অর্পণ করলেন (১৫/৮৭)। অযোধ্যাধিপতির কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার দায়িত্বকে লাঘব করার মানসে প্রাদেশিক সরকারের বসুধা গোড়াপত্তন রাজনৈতিক দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। কয়েকদিন পরেই ভরত রাজ্যাভিষেক যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত তক্ষ ও পুষ্কল নামক দুই পুত্রকে তাদেরই নামানুসারী তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী

নামক রাজধানীতে অভিষিক্ত করলেন। লক্ষ্মণও রামের আদেশক্রমে তাঁর দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথ রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করলেন। অবশেষে স্বয়ং রামচন্দ্র আত্মজদ্বয় কুশ ও লবকে যথাক্রমে কুশাবতী নগরী ও শরাবতী নগরীর অধিপতি-পদে বরণ করলেন।

কিন্তু সেই একদিন রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ও রঘুবংশের দ্বাদশ সর্গে কেন্দ্রীয় রাজধানীর একক রাজ-নায়কের কী অপূর্ব সুন্দর প্রভুত্বের আদর্শ দেখা গিয়েছিল। রামচন্দ্র দীর্ঘ চোদ্দ বছর বনবাসী-জীবন গ্রহণ করা সত্ত্বেও, মধ্যম ভ্রাতা ভরত রাজ্যশাসন পেয়েও গ্রহণ করেন নি। তাঁর রাজ্যলাভের পরিকল্পনার পথে জন্মদাত্রী কৈকেয়ী ও পরিচারিকা মন্থরার ষড়যন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অযোধ্যার অনতিদূরে নন্দীগ্রামের তপোবনে এক রাজ্য—এক রাজার পাদুকামাত্র সম্বল করে তাপসের মতো কালযাপন করেছেন, রামচন্দ্রের নামে—রাজ্যশাসনের সরোবরে ত্যাগের শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে। সে এক কঠোর ব্রত! সেই ব্রতের নাম 'অসিধার' ব্রত।

সেই আদর্শের স্থলে পঞ্চদশ সর্গে পাঠক কী দেখলেন? দেখলেন, সমান্তরাল শক্তির বহুধাবিভক্ত সমান্তরাল শক্তির বসুধাবিভক্ত বহুবিধ রাজধানীর, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় শক্তির কী অর্থহীন বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি। যার জন্য একমাত্র দায়ী স্বয়ং রামচন্দ্র। এক অযোধ্যা রাজধানী ভেঙে মধুরা, বিদিশা, সিন্ধু, তক্ষশিলা, পুষ্কলাবতী, কারাপথ, কুশাবতী ও শরাবতী—এই আটটি স্বাধীন রাজধানীর সৃষ্টি হ'ল। চার ঈশ্বরাবতারের আট পুত্র আটটি রাজ্যের আধিপত্য পেলেন। সমান্তরাল শাসনের গর্ভে ঐক্যের গর্ব বিলীন হয়ে গেল।

রাম-চরিত্রের ছিদ্রপথে রাজ্য-রাজনীতির বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতি রাম-চন্দ্রের জীবনের ভাগ্যবিপর্যয়টিকে সত্যই দৃঢ়মূল করে তুলেছে। রাম-চরিত্রের এই ট্র্যাজিক প্রতিবেদনে ভ্রান্তির চোরাপথে রাম-রাজত্বের চরমতম ব্যর্থতার মধ্যেই রামায়ণের সমাপ্তি।

কিন্তু রঘুবংশের কবি কালিদাস সেই ট্র্যাজেডিকে আরও ঘননিবদ্ধ করে একটি মহান ঐতিহাসিক বংশের পতনের সুরকে আলাপের আঙ্গিকে ধীরে ধীরে প্রবাহিত করে এমন এক বন্দীশে বেঁধেছেন, যেখানে একটি রাজবংশের সমূহপতনের কার্যকারণকে পাঠক-দর্শক-সমালোচক ও গুণীজন বিরূপ বক্তব্যে নিন্দা করতে পারবেন না।

কালিদাসের পিতৃহৃদয়

মহাকবি কালিদাসের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার নতুন করে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানপীঠে তাঁর অতুলনীয় কাব্য-সাহিত্যের বহুল আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তাই কালিদাস বিশেষ কোন একটি যুগের কবি নন ; যতদিন ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তিনিও অবিস্মৃত থাকবেন। কিন্তু এই যুগন্ধর ও ক্ষণজন্মা কবির জীবনের পূর্ণ ইতিহাস আবিষ্কারের দায়িত্বপালনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সব ঐতিহাসিকই ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার জন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চা-বিমুখতা যে পরিমাণে দায়ী, তার চেয়েও বোধহয় বেশি দায়ী মহাকবি স্বয়ং। কারণ তাঁর সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোথাও তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলে যান নি। তিনি কোথায় জন্মেছেন, কীভাবে লালিত হয়েছেন— তিনি কার পুত্র, আর তাঁর পুত্রই বা কে—এসব তথ্যের উল্লেখ কোথাও নেই। এটাকে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটা ট্র্যাজেডিই বলা যেতে পারে। তবু কালিদাসের জীবনের কোন দিক নিয়ে যদি কিছু আলোচনা করতে হয় তবে একমাত্র তাঁর রচনাবলী থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদের আহরণ করতে হবে। তাঁর কাব্যাবলী বাচ্যাতিশায়ী ও ব্যঞ্জনামণ্ডিত, একথা সর্বজনবিদিত। তাঁর কাব্যের মূল শক্তিও এই ব্যঞ্জনার মধ্যেই নিহিত। কাজেই তাঁর ব্যক্তি-হৃদয়ের কোনপ্রকার প্রতি-ফলনের প্রকাশ একমাত্র তাঁর কাব্যের ব্যঞ্জনা-বিশ্লেষণের সাহায্যেই প্রাপ্তব্য।

কালিদাসের কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কুমারসম্ভব'-এ কিছু পরিমাণে ও 'রঘুবংশ'-এ বিপুলভাবে এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে কবি তাঁর এই কোমল চিত্তবৃত্তিটি এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন যে বহুস্থানে পিতার চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের পিতৃ-হৃদয়েরই একটা প্রক্ষেপ-চিত্র এঁকে ফেলেছেন বলে মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মতে রঘুবংশ কাব্য ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক—এই দুখানি গ্রন্থই

কালিদাসের পরিণততম প্রতিভার নিদর্শন। কাজেই এই দুখানি গ্রন্থ একটু বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্য সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে বলে মনে করি।

'রঘুবংশ' মহাকাব্যের প্রথম রাজ-নায়ক দিলীপ, বহুদিন শৌর্য-বীর্য ও প্রজাপালনের অনুপম আদর্শ স্থাপন করার পর হঠাৎ একদিন গভীর মানসিক বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ, তাঁর সবই আছে কিন্তু অপুত্রক-জীবনের বেদনা উপশমের কোন উপায় নেই। একমাত্র পুত্রহীন-তার জন্য তাঁর এতবড় রাজত্বও আজ তাঁর সন্তোষবিধানে অক্ষম। উপায়ান্তর না দেখে রাজা দিলীপ ও রাজ্ঞী সুদক্ষিণা পুত্র-কামনায় কুল-গুরু বশিষ্ঠের আশীর্বাদলাভার্থ ঋষির আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হয়ে রাজদম্পতি কুলগুরুর কাছে যেভাবে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাতে মনে হয় যেন এক অতিসাধারণ প্রজা মহা-রাজের কাছে এসে তার ইচ্ছাপূরণের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে। এই চিত্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ সম্পর্কের বা গুরু-শিষ্য সম্পর্কে যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায় পুত্র-কামনার এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয়। শুধু তাই নয়, পিতৃপুরুষের পিণ্ড-লোপের আশঙ্কা দূরীকরণে অসমর্থ হওয়ায় মহারাজের পুত্রহীন জীবন যে পীড়াদায়ক পিতৃঋণের দায়েও আবদ্ধ—'অসহ্যপীড়ং ভগবন্ ঋণমন্ত্য-মবেহি মে' (র-১/৩১), এই উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি কুলগুরুকে সে-কথাও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। মহারাজের সব কথা শোনার পর ত্রিকালদর্শী বশিষ্ঠদেব বললেন—'মানুষ যত ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, কর্তব্যবিমুখতার শাস্তি তাকে অবশ্যই পেতে হয়। বহুদিন পূর্বে আমার মানসকন্যা সুরভি নাম্নী গাভী তোমার দ্বারা একদিন অবহেলিতা হয়েছিল। আমার সন্তানের অপমান, আমার নিজেরই অপমান। সেই অপরাধের শাস্তি তোমার এই অপুত্রক জীবন। তোমার প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র পথ, সেই সুরভির কন্যা নন্দিনী-গাভীকে যথোচিত সেবায় সন্তুষ্ট করা। নন্দিনী সন্তুষ্ট হলেই তার প্রসাদে তুমি সুপুত্র লাভ করবে। পারবে তুমি এ কাজ করতে?'—শুধু রাজার নয়, কুলগুরু বশিষ্ঠের মধ্যেও পিতৃহৃদয়ের কী চমৎকার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে এখানে। মহর্ষি বশিষ্ঠের মানসকন্যা কোন মানবী নয়, সুরভি গাভী। অথচ এই

মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিও মুনির কী অপরূপ বাৎসল্য !

তারপর শুরু হ'ল মহারাজের গো-সেবার পালা। কাব্যে সেই এক-নিষ্ঠ শ্রান্তিক্লান্তিহীন সেবার যে পরিচয় আমরা পাই তার কোন তুলনা নেই। এইভাবে একুশ দিন অতিক্রান্ত হবার পর এল পরীক্ষার পালা। সে-পরীক্ষাতেও মহারাজ জয়ী হলেন—সুরভি-সুতার পূর্ণ প্রীতিসাধনে সক্ষম হলেন। সন্তুষ্ট কুলগুরুর আন্তরিক আশীর্বাদ নিয়ে যথাসময়ে রাজ-দম্পতি রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং মহারানী সুদক্ষিণাও কিছুকাল পরেই গর্ভবতী হলেন।

কাব্যে পৌরাণিক-বৃত্তান্তের অন্তর্ভুক্ত এই গো-সেবার উল্লেখ কি অনিবার্য ছিল? মহর্ষি বশিষ্ঠের নিজস্ব যে দৈবীশক্তি ছিল তাতে তো মনে হয়, শিষ্যের প্রতি শুধু—"তুমি পুত্রের জনক হও!"—এই কথা বললেই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু মহারাজের পিতৃহৃদয়ের আকূতির গভীরতা কতখানি তা বোঝানোর জন্যই পৌরাণিক বৃত্তান্তের ঐ গো-সেবার অধ্যায়টি কাব্য-কাহিনীর মধ্যে এনে ফেললেন কালিদাস। মহারাজ দিলীপের সন্তানকামনা কত গভীর, কত তীব্র ছিল, তা কবির পরবর্তী একটি শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গর্ভবতী মহারানী সুদক্ষিণাকে দেখে দিলীপ মনে করলেন, সুদক্ষিণা কত গৌরবময়ী! কিন্তু তাঁর এই গৌরব মগধরাজ দুহিতার অথবা সূর্যবংশীয় সম্রাজ্ঞীর গৌরব মাত্র নয়। তার চেয়ে অনেক মহত্তর এই গৌরব; কবির ভাষায় —একমাত্র রত্নগর্ভা বসুন্ধরার অথবা অগ্নিগর্ভা শমীলতার অথবা অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর গৌরবের সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে।

"নিধান গর্ভামিব সাগরাম্বরাং শমী-মিবাভ্যন্তর-লীন-পাবকান্।
নদীমিবান্তঃ সলিলাং সরস্বতীং নৃপঃ স-সত্ত্বাং মহিষীসমন্যত॥"

(র-৩/৯)

সুদক্ষিণার এই গৌরবকে মহারাজ দিলীপ পুত্রলাভের আনন্দজনিত গৌরব হিসাবে বিচার করেছেন।

যথাকালে মহারাজ দিলীপের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। তার নাম রাখা হ'ল রঘু। সেই রঘুর শৈশব-সৌন্দর্যে রাজা আনন্দে বিমোহিত হয়ে যেতেন। রঘুকে বুকে চেপে ধরে আনন্দ-নিমীলিত নয়নে চির-আকাঙ্ক্ষিত পুত্রস্পর্শরূপ অমৃতরস আস্বাদনে মহারাজ কৃতার্থ হতেন।

"......উপান্ত সংমীলিত-লোচনোনৃপঃ, চিরাৎ সুতস্পর্শরসজ্ঞতাং যযৌ॥" (৩/২৬)। অপত্য স্নেহের এই অনবদ্য প্রকাশ যে কবির নিজেরই উপলব্ধি-সঞ্জাত সে সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে ?

রঘু নিজে রাজা হবার পর দিগ্বিজয় করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন এবং যজ্ঞান্তে সম্মানিত অতিথি বরতন্তুশিষ্য কৌৎস মুনিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী দান করলেন। দানগ্রহণে সন্তুষ্ট হয়ে ঋষি মহারাজ রঘুকে অপ্রত্যাশিতভাবে যে বর প্রদান করলেন তাতেও কবির পিতৃ-হৃদয়ের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মহারাজ রঘুকে এই ভাষায় আশীর্বাদ করলেন—'আপনার পিতা যেমন বিশ্ববরেণ্য আপনাকে পেয়ে ধন্য হয়েছেন, আপনিও আপনার নিজের মতো পুত্ররত্ন লাভ করে ধন্য হবেন।' .....'পুত্রং লভস্বাত্ম-গুণানুরূপং ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব।' (৫/৩৪)

ঋষির বরে রঘুর পুত্র অজের জন্ম হ'ল। অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। দশরথের জীবনের একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে কবি পুত্র-বিয়োগব্যথাতুর পিতৃহৃদয়ের অতি চমৎকার একটি চিত্র অঙ্কিত করেছেন। অরণ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে একদিন মহারাজ দশরথ জলাশয়ে কুম্ভপূরণের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, বোধ হয় এ-শব্দ বন্যহস্তীর জলপানের শব্দ, এবং তৎক্ষণাৎ হস্তী-শিকারের উদ্দেশ্যে তাঁর অব্যর্থ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণে অন্ধমুনির পুত্র নিহত হ'ল। সে সেখানে এসেছিল তার পিপাসার্ত পিতামাতার জল সংগ্রহের জন্য। বৃদ্ধ তাপস অন্ধমুনির হৃদয় পুত্রশোকে বিদীর্ণ হয়ে গেল। মুনিজনোচিত প্রশান্তি ও স্থৈর্য হারিয়ে তিনি তখন অপুত্রক মহারাজ দশরথকে কঠোর ভাষায় অভিশাপ দিলেন—'তুমি আমারই মতো পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করবে।' এই অভিশাপ দশরথকে যুগপৎ অপুত্রকের বেদনায় ও সম্ভাব্য পুত্রলাভের আনন্দে সংশয়-দোলাচলচিত্ত করে তুললো। এইভাবে বহু বৎসর অস্থির মানসিকতার মধ্যে কালযাপন করার পর ঋষির অভিশাপ আশীর্বাদে রূপান্তরিত হয়ে গেল—মহারাজ দশরথ চারিটি পুত্রের জনক হলেন। এরপর পুত্রশোকে পিতৃহৃদয় কীভাবে নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে পারে দশরথের মৃত্যু-চিত্রণের মধ্যে আমরা সেই ব্যঞ্জনাই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখলাম।

এবার 'রঘুবংশ' কাব্যে রামের পিতৃহৃদয়ের প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। সীতাকে সন্তানসম্ভাবিতা দেখে এবং ভবিষ্যৎ পিতৃত্বের কথা চিন্তা করে রামচন্দ্রের যে আনন্দের বর্ণনা কবি করেছেন তার স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী অথবা 'পরিণাম-রমণীয়' হতে পারে নি। রামচন্দ্রের জীবন ছিল প্রজানু-রঞ্জনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। সেই কর্তব্যপালনের অনুরোধে মূর্খ প্রকৃতিপুঞ্জের সন্তোষ বিধানার্থ রামচন্দ্র গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করলেন। সীতা নির্বাসনের পর রামচন্দ্র যে মর্মান্তিক বেদনা ভোগ করেছিলেন তা যে শুধু প্রিয়া-বিচ্ছেদজনিত নয়—ব্যর্থকাম পিতৃহৃদয়ের ব্যথাও যে তার সঙ্গে প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত ছিল—কবির ব্যঞ্জনা-গর্ভ ভাষা থেকে তা বুঝে নেওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য হয় না। এখানে কবি কালিদাস অনেকাংশে আদিকবি বাল্মীকির নিকট ঋণী বলে মনে হয়। তবে এ-ঋণ অনুসরণ-ঋণমাত্র, একে অনুকরণ কিছুতেই বলা চলে না।

অপ্রত্যাশিত হলেও 'রঘুবংশ' কাব্যের কবি, তপোবনবাসী ঋষিকবি বাল্মীকির পিতৃহৃদয়েরও এক অনবদ্য-সুন্দর চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন—সীতা ও আদিকবির সম্পর্ক বর্ণনার মধ্য দিয়ে। চতুর্দশ সর্গের সত্তর থেকে আটাত্তর সংখ্যক শ্লোকে আমরা দেখতে পাই, কী-ভাবে বাল্মীকির পিতৃহৃদয়ের স্নেহাঙ্কুর ক্রমে ক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং কীভাবে সেই মমতাময় মহীরুহের শীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে জনক-তনয়ার শোকসন্তপ্ত চিত্ত সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে কবি কণ্বমুনির চরিত্র-চিত্রণ করতে গিয়ে যেভাবে তার মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ করেছেন, স্বীয় পিতৃহৃদয়ের অপ-রূপ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, তা সত্যই বিশ্বসাহিত্যে বিরল। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আমরা মহাকবির বাস্তবজীবনের কোন এক কন্যা-বিদায়ের লগ্নে সত্যসত্যই গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতগণ একটি মূল্যবান্ কথা বলেছিলেন—'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক কালিদাসের সর্বস্ব ; আর সেই নাটকের সর্বস্ব হ'ল চতুর্থ অঙ্কে যেখানে শকুন্তলা পতিগৃহে চলে যাচ্ছেন, সেই দৃশ্যটি। কথাটা সত্য। এই চতুর্থ অঙ্কে, 'যত্র যাতি শকুন্তলা'—সেই অংশে কবি তাঁর দৃশ্য কাব্যখানিকে এমনভাবে করুণরস সমৃদ্ধ করে তুলেছেন যা সর্বপ্রকার নাটকীয় কলা-

কৌশলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। যা সত্যই মর্মস্পর্শী। আর সেই সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মমতাময় পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে। শকুন্তলার পতিগৃহে গমনের প্রাক্কালে মহর্ষি কণ্ব, শকুন্তলার পালক-পিতা মাত্র হওয়া সত্ত্বেও অনুভব করেছেন,—তাঁর হৃদয় বিষাদসমাচ্ছন্ন, কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ এবং দুই চক্ষু উদ্গত অশ্রুর জড়তায় দৃষ্টিহীন। তিনি আপন মনে চিন্তা করেছেন—"আমি বনবাসী; স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ অবসাদ উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু।"—(বিদ্যাসাগর)।

"বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশম্ অহো স্নেহাৎ অরণ্যৌকসঃ।

পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈর্ন বৈ॥" (শকু—৪/৫)

কিন্তু এই দৃশ্যের ব্যঞ্জনা অন্যতর ও গভীরতর। "গৃহী সংসারীদের এমন অবস্থায় না জানি কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়"—এই কথা কয়টি কণ্বমুনি সম্বন্ধে উক্ত হলেও কবির নিজের পিতৃহৃদয়কে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। তা না হলে আজীবন আশ্রমিক, কঠোর সাধনারত, সন্ন্যাস-মন্ত্রে পরিশুদ্ধ, সংসারী জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কণ্বদেবের কন্যা বিদায়বিধুর মুহূর্তে সংসারী ব্যক্তির কথা মনে পড়ল কি করে! কালিদাস যেন সুচিন্তিতভাবেই নিজের পিতৃহৃদয়ের একটি নির্দিষ্ট বেদনা-মুহূর্তকে কণ্বমুনির এই ব্যথাতুর বক্তব্যের মধ্যে সুনিপুণ শিল্প-কৌশলের সাহায্যে প্রক্ষেপ করেছেন। সমগ্র আশ্রম প্রকৃতির বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-পত্রে বিষাদের ছায়া পড়েছে; মৃগ-ময়ূরী-কোকিল সকলের কণ্ঠে শোকের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে; আর তারই মধ্যে শুভ্র শ্মশ্রুকেশধারী, অজিনবাসাবৃত তনু, তপঃক্লিষ্ট শীর্ণদেহ মুনি-পিতার অশ্রুসজল উপস্থিতি—সব-কিছু মিলে আশ্রম পরিবেশকে এক অপরূপ কারুণ্যের সৌন্দর্যে ও মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে। এ-দৃশ্যের আবেদন সত্যই ভাষার অতীত। কিন্তু শোকের মধ্যেই পিতৃ-হৃদয়ের কর্তব্যবোধ শেষ হয়ে যায় নি, মানসকন্যার ভাবী-জীবনের মঙ্গল ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় যে-আশীর্বাদ ও উপদেশ কণ্বমুনি দান করেছেন সেগুলি সন্ন্যাসী পিতার চেয়ে সংসারী পিতার ক্ষেত্রে আরও অধিকতর সময়োচিত ও প্রযোজ্য বলে মনে হয় না কি?

'শকুন্তলা' নাটকের সপ্তম অঙ্কে যখন মহারাজ দুষ্মন্ত ইন্দ্রসভা থেকে

মাতলিপরিচালিত রথে পৃথিবী অভিমুখে নেমে আসছেন তখন হেমকূট পর্বতে অবস্থিত এক অতিমনোহর তপোবন তাঁদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। মাতলির কাছে রাজা জানতে পারলেন যে, এই আশ্রমে দেব-দানবাদির পিতা প্রজাপতি ঋষি কশ্যপ-পত্নী অদিতির সহিত কঠোর তপস্যায় নিরত আছেন। তখন তিনি মহর্ষিকে প্রণাম-প্রদক্ষিণাদি করার উদ্দেশ্যে সেখানে রথ থামিয়ে অবতরণ করলেন। তখনও তিনি জানতেন না এখানে তাঁর জন্য কি অপ্রত্যাশিতপূর্ব বিস্ময়ানন্দ অপেক্ষা করে আছে। এর অল্পক্ষণ পরেই আশ্রমলালিত শকুন্তলা-সুত সিংহ-শাবকের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী শিশু-ভরতকে দেখতে পেলেন—এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর সুপ্ত পিতৃহৃদয় এই তেজোদ্দীপ্ত বালককে দেখে হর্ষ-বিষাদে চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—"কিং নু খলু বালেংস্মিন্ ঔরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ। নূনম্ অনপত্যতা মাং বৎসলয়তি।" (শ-৭/৪০)—'এ কী, এই বালককে দেখা অবধি এর উপর আমার পুত্রস্নেহ জন্মাছে কেন! আমি নিঃসন্তান, তাই বোধহয় একে দেখে আমার মন এমনভাবে বাৎসল্যরসে পূর্ণ হয়ে উঠছে।'—নিরুদ্ধ পিতৃ-হৃদয়ের কী অপূর্ব অভিব্যক্তি! সপ্তম অঙ্কের পঞ্চাশ-সংখ্যক শ্লোকে পিতৃহৃদয়ের ভাবাবেগ আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে! আধো-আধো স্বরে শিশু-ভরত যখন সিংহশাবকের সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, খেলছে —তখন রাজার হৃদয়ের অবস্থাটি যে কিরূপ হয়ে উঠল তা দুর্ভাগ্য অপুত্রক পুরুষ ছাড়া অন্যের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সত্যই অতি দুঃসাধ্য। রাজা যখন শিশুর কাছে গেলেন, তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করতে লাগলেন তখন তাঁর পিতৃহৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শেই বোধহয় শিশুর মনও অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাই দেখে এক তাপসী মন্তব্য করলেন—'আপনার আকৃতির সঙ্গে বালকের আকৃতির বড়ই মিল। তাছাড়া আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি আপনার কাছে গিয়ে এই দুরন্ত বালক কেমন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো হয়ে গেল!'

তারপরই মিলন। সবাই জানলেন সব-কিছু। শকুন্তলা স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। দুষ্মন্তের অপত্যস্নেহ বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়ও ভরতকে বুকে জড়িয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করল—অপত্যস্নেহের সুধাসিন্ধুতে অবগাহন করে কৃতার্থ হ'ল।

কালিদাসের সমস্ত কাব্য-নাটকেই পিতৃহৃদয়ের অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রঘুবংশ কাব্যে ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকে কবি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেভাবে নিজের পিতৃহৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা অন্যত্র কোথাও আমরা পাই না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবি কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। তথাপি তাঁর রচনাবলীর—বিশেষ করে আলোচ্যমান কাব্য-নাটক দুখানির অন্তর্ভুক্ত ব্যঞ্জনাধর্মী শ্লোকগুলি ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখলে বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না যে তিনি নিজেও সন্তানের পিতা ছিলেন—সন্তানের সাহচর্যজনিত অনাবিল আনন্দ এবং সন্তানবিয়োগ-জনিত মর্মন্তুদ বেদনা দুই-এরই সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করে-ছিলেন নিজের জীবনে।

বস্তুত, কাব্য-নাটকে পিতৃহৃদয়-চিত্রণের মধ্যে মহাকবির আত্ম-প্রক্ষেপ প্রতিনিয়ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের দশজনেরই মতো তাঁর জীবনও হাসিকান্নার টানা-পোড়েন দিয়ে বোনা হয়েছিল। তিনি আমাদেরই একজন ছিলেন।

কালিদাসের পরমা-নায়িকা

কবি-নাট্যকার কালিদাসের তিনটি নাটকের বিখ্যাত নায়িকারা হলেন —মালবিকা, উর্বশী ও শকুন্তলা। দুটি নাটকের নামকরণে নায়ক-নায়িকা ও একটির নামকরণে শুধু নায়িকাই অধিষ্ঠিত হয়েছেন। "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" "বিক্রমোর্বশীয়ম্"—নাটক দুটির কাহিনী অতি সামান্যভাবে পুরাণে পাওয়া যায়। শকুন্তলার কাহিনী, মহাভারতে যে-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্য থেকে নাটকের উপাদান তৈরি করা বেশ কঠিন কাজ। কালিদাস, সম্পূর্ণ নিজস্ব কবি-কল্পনার সাহায্যে যেভাবে মালবিকা, উর্বশী ও শকুন্তলাকে এঁকেছেন, তা সম্পূর্ণই নিজস্ব ব্যাপার। উপরিউক্ত নায়িকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এখানে কবির ঋণ স্বীকারের খুব একটা সুযোগ নেই। কবির মহাকাব্য, 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত'-এর নায়িকা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্রথমটির নায়িকা পার্বতী, সামাজিক মানবী-চরিত্র নয়, যেখানে নায়ক স্বয়ং মহাদেব। সুতরাং পার্বতী-চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে কালিদাসকে অসাধারণত্বে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। মেঘদূতের নায়িকা 'যক্ষপ্রিয়া' তো বিমূর্ত সৌন্দর্যের প্রতীক, তথা কাব্যসুষমায় মণ্ডিত হতে হতে সে স্বর্গীয় পরিবেশে অলকাপুরীর প্রকোষ্ঠে বিষাদ-বিরহ বিধুর ভাব-ব্যঞ্জনায়, কিছুটা অতিপ্রাকৃতও বটে। মূলকথা—মালবিকা, উর্বশী, শকুন্তলা, পার্বতী ও যক্ষপ্রিয়া—এঁরা মাধুর্যময়ী নায়িকা হলেও, এঁদের সৃষ্টি করতে গিয়ে কবিকে ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় নি। কারণ, সব নায়িকা চরিত্রগুলিরই অকৃত্রিম স্রষ্টা কালিদাস স্বয়ং। কিন্তু তাঁর পরিণত প্রতিভার সংস্করণ, 'রঘুবংশ'কাব্যে তিনি নায়িকা সীতাকে যেভাবে এঁকেছেন ও পাঠকের চোখ মনের সামনে তুলে ধরেছেন, সেটা এক অতুলনীয় নায়িকা-সৃষ্টির নজির বলা যেতে পারে। সীতা-চরিত্র, বহুল আলোচিত এক চরিত্র। আদিকবি বাল্মীকির প্রথম প্রয়াসে অনুপ্রাণিত মহাকবি ভাস, অশ্বঘোষ প্রমুখ কবি নাট্যকারেরা সীতা-চরিত্র সৃষ্টিতে অনেক আয়াস নিয়েছিলেন। বাল্মীকি, ভাস, অশ্বঘোষের উত্তরকালে

দাঁড়িয়ে কবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশ কাব্যে যেভাবে সীতা-চরিত্রের উদ্বোধন করেছেন, সাহিত্যের বিচারে সেখানেও তাঁকে অদ্বিতীয় নায়িকা স্রষ্টা বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। এখানে বাল্মীকির সঙ্গে প্রতি-যোগিতার কোন প্রশ্ন নিশ্চয়ই আনা উচিত নয়। কিন্তু মহান শক্তিধর আদি কবির অনুসরণ করেও, সীতা-চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর যে অননুকরণীয় দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তা এককথায় অসাধারণ। তাই শকুন্তলা, যক্ষ-প্রিয়ারা থাকা সত্ত্বেও, কবির পরমা নায়িকা যে সীতা, তারই একটা কাব্য বিষয়মুখী প্রতিবেদন বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হচ্ছে।

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ নায়িকা, ভারত-মহাকাব্যের মহাকবি বাল্মীকির মানসকন্যা সীতা, কালিদাসের রঘুবংশে অনেকখানি স্থান জুড়ে পাঠক সাধারণের কাছে অনেক নতুন তথ্যে পরিবেশিত হয়েছেন। রঘু-বংশের প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত নায়করা হলেন, যথাক্রমে—দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রামচন্দ্র, প্রকৃতপক্ষে আপামর পুণ্যাত্মা ভারতবাসীর কাছে সূর্যবংশ তথা রঘুবংশের বহুল পরিচিত রাজনায়কবৃন্দ। রামচন্দ্রের পরবর্তী রঘুবংশীয় রাজা কুশ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত যে বাইশজন নরপতির নাম পাওয়া যায়, তাঁরা নামে মাত্রই রাজা—প্রজারঞ্জনে নয়। উপরিউক্ত মহান পাঁচজন রাজনায়কের নায়িকা হিসাবে, কাব্যিক ও পৌরাণিক তথ্যানুসারে আমরা যাঁদের পাই তাঁরা হলেন—দিলীপের সুদক্ষিণা, রঘুর নায়িকা (?), অজের ইন্দুমতী, দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং রামচন্দ্রের সীতা। রঘুর নায়িকাকে আমরা কোথাও পাই না। না রামায়ণে, না পুরাণে, না রঘুবংশে। মূল মহাকাব্যের নায়ক-চরিত্রের নায়িকা নির্বাচনে স্বয়ং কালিদাসই যখন নীরব, তখন আর এর উপর নতুন করে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

দিলীপ, অজ, দশরথের নায়িকারা রঘুবংশের আলোকে যতটা আলোকিত হয়েছেন, রামচন্দ্রের নায়িকা সীতা অনেক বেশি পরিমাণে আলোকিতা হয়েছেন। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, কালিদাসের কাছে সুদক্ষিণা, ইন্দুমতী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা যত-খানি পরিচিত, তার থেকে সীতা অনেক বেশি পরিচিত। তার কারণ, রঘুবংশের কবির কাছে বাল্মীকির 'কৃত-বাগদ্বার' রামায়ণ, সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে যথেষ্ট কাজ করেছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, সীতা-চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু আন্তরিক উপাদান আছে, যেগুলি কাব্য

সাহিত্যের রসাল রসদে পরিপূর্ণ। যার মধ্যে রূপ যৌবন পাতিব্রত্য ও সন্দিগ্ধতা, কামনা লোভ ত্যাগ তিতিক্ষা ও তেজস্বিতা, বাঁচার ইচ্ছা ও প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প—পরস্পরবিরোধী কতগুলি দোষগুণের সমাবেশ হয়েছে—যেগুলি কবির সৃজনীশক্তিকে উন্মুখ করে তোলে। এহেন চরিত্রের রূপায়ণে কাব্যের অনেকাংশ জুড়ে তাঁর যে আবর্তন হবে, তা বলাবাহুল্য। তাই আমরা দু-একটি সর্গের মধ্যে সুদক্ষিণা ইন্দুমতীদের নিঃশেষ হতে দেখেছি। আবার দীর্ঘ পাঁচটি সর্গ জুড়ে যথাক্রমে, একাদশ থেকে পঞ্চদশ সর্গ পর্যন্ত সীতার সুখ-দুঃখের আরোহ অবরোহাত্মক ঘটনা-বহুল জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সাহিত্যরসসমৃদ্ধ চিত্রায়ণ দেখে অবাক মুগ্ধ ভাবনায় নতুন করে সীতা-চরিত্রকে লাভ করেছি।

কবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশের একাদশ সর্গে, সীতাকে প্রথম উপস্থাপিত করেছেন 'শ্রী'রূপে। 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মী। 'রুদ্র কার্মুক' অর্থাৎ হরধনু ভঙ্গের বীর্যশুল্ক হিসাবে মিথিলাধিপতি জনক, রামের হাতে,—'অযোনিজাং রূপিনীং শ্রিয়মিব ন্যবেদয়ৎ'। —অযোনিসম্ভবা মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সীতাকে সম্প্রদান করলেন। (রঘু—১১/৪৭)।

লক্ষ্মী হলেন 'বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি'—অর্থাৎ বিশ্বরূপের ভার্যা। গীতার একাদশ অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিশ্বরূপ। বাল্মীকির যিনি কন্যাস্বরূপা, কালিদাসের কাছে তিনি বিশ্বরূপের ভার্যা লক্ষ্মী। পদ্মালয়ের লক্ষ্মীই, ক্ষিতিরূপা ধরিত্রীর সর্বত্র বিরাজিতা। তাই তিনি অযোনিমা তথা ধরিত্রী-গর্ভসম্ভূতা। উর্বরতার প্রতীক। প্রাণস্পন্দনের এক অপূর্ব নজির। বিশ্ব-রূপ—মহান পুরুষ। উর্বর ধরিত্রী—মহতী প্রকৃতি। "···লাঙ্গল হস্তে কর্ষণ করতে করতে আমি উঠলাম—" তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কর্ষতঃ যজ্ঞ মণ্ডলম, অহং কিলোত্থিতা ভূত্বা···তারপর জগতে এসে রাজার কন্যা হলাম; তারপর বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীকে বিশ্বরূপের সঙ্গে, হরধনু ভঙ্গে আমি রামের 'রমা' হলাম। কালিদাস বললেন—এই রমা, সীতা, বিশ্বপ্রকৃতি—এঁরা সবাই একই অঙ্গে সৌন্দর্যের মহত্বের এক অনর্ঘ শ্রী। এই 'শ্রী' নায়কের ইচ্ছাশক্তির আধার। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সৃষ্টিকার্যের সমাধা হয়। আ-সমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাপথে এই ইচ্ছাশক্তির সংকল্পের মধ্যেই রামের সীতা, নারায়ণের লক্ষ্মী, কৃষ্ণের রাধা, শিবের শক্তি, যজ্ঞের দক্ষিণা ও ব্রহ্মের মায়া অবস্থিত রয়েছে। সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তির একক-রূপের নাম প্রকৃতি-শক্তি বা নারী শক্তি। প্রকৃতি-

শক্তিই রামচন্দ্রের জীবনে সীতারূপে আবির্ভূতা।

একাদশ সর্গে, কালিদাস তাঁর পাঠকদের সামনে সীতাকে ঐ 'শ্রী'-রূপে উপস্থাপিত করার আগে, প্রকৃতি-শক্তির একটি বীজ বপন করে, সীতার আগমন বার্তাকে, অপূর্ব সুন্দর সাহিত্য সংকেতে পাঠক সাধারণ-কে বিমুগ্ধ করে দিয়েছেন। এই বীজ বপনের সংকেতটি প্রেম নিস্যন্দ হৃদয়ানুভূতির এমন এক অসাধারণ প্রস্তুতি, যা সংস্কৃত সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনেও বিরল দুর্লভ এক নজির। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নানা দিক দেশ অতিক্রম করে রাম ও লক্ষ্মণ মিথিলার অভিমুখে যাওয়ার পথে গৌতমমুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। দার্শনিক গৌতমের প্রেমিকা পত্নী অহল্যা, প্রেমের অজ্ঞাত অপরাধে গৌতমের দ্বারা শাপভ্রষ্ট হয়ে প্রস্তরে পরিণত হয়েছিলেন। যুগ-যুগান্ত ধরে ধরিত্রীর অঙ্গে, রস দ্রবীভূতা অহল্যা, নিরস প্রস্তরীভূতা সত্তায়, প্রেম-বিয়োগ বিধুর অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। বিধির বিধান বিহিত পরিকল্পনায় রামচন্দ্রের পাদ-স্পর্শে অভিশপ্তা অহল্যা, সরস কোমল প্রাণের মানবী মূর্তিমতীতে রূপান্তরিত হয়ে গৌতম-সঙ্গ লাভ করলেন। এই হ'ল উপাখ্যানের আলেখ্য। কিন্তু কালিদাস এই আলেখ্যের নেপথ্যে, ভাবী রাম-সীতা মিলনের একটি নিবিড় প্রেম-সম্পৃক্ত হৃদয়ানুভূতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন। অহল্যা-গৌতমের পুনর্মিলনের সূত্রপথ ধরে, অদূর ভবিষ্যতে রাম-সীতার মিলনের পূর্বাভাষটি রঘুবংশের একাদশে বাণীমূর্তি পরিগ্রহ করে পাঠককে শোনাল—"প্রত্যপদ্যত চিরায় যৎ পুনশ্চারু গৌতম বধূঃ শিলাময়ী। স্বংবপুঃ স কিল কিল্বিষচ্ছিদাং রামপাদ-রজসামনুগ্রহঃ" (১১/৩৪)। অর্থাৎ— অভিশপ্ত গৌতমবধূ অহল্যা, রামচন্দ্রের পদরেণু-স্পর্শে নিজের সতনু ফিরে পেলেন।—এখানেই কাব্যিক বিস্ময় বিরত হয় নি। প্রস্তরীভূতা অহল্যার পূর্ব জীবনের সঙ্গে সন্দেহের যে ভ্রূকুটি বীজ নিহিত হয়েছে, সেই সন্দেহ-বীজটির ক্রমবর্ধমান ফলশ্রুতি, সীতার সতীত্ব ও বিবাহ জীবনোত্তর পরিস্থিতির মধ্যে, বাল্মীকির আশ্রমে সীতা-পরিত্যাগের শাখাপ্রশাখায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অহল্যা-গৌতম সংবাদের মধ্যে সন্দেহের পর অভিশাপ এবং তারপর পুনর্মিলন। সেই পুনর্মিলন বীজের পরবর্তী শ্লোকেই রামের বধূলাভ। তার অনেক পরে উত্তরাকাণ্ডের মধ্য-আয়ুতে, সীতার উপর সন্দেহ, কিন্তু পুনর্মিলনে, বিয়োগান্তক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চমৎকারিত্বপূর্ণ চিরন্তন এক বিচ্ছেদ।

কালিদাসের বিয়োগান্তক ভাবনার পারিপাট্য এখানে অসাধারণত্ব লাভ করেছে।

'শ্রী'-রূপিণী সীতাকে, রামচন্দ্র বধূরূপে গ্রহণ করে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। এর পরের সংবাদ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জ্ঞাত বিষয়। শর্ত সৌজন্যের খাতিরে, পারিবারিক অদূরদর্শী চক্রান্ত, রামকে পিতৃসত্য পালনের তাগিদে বনবাসী করে ছাড়ল। সঙ্গী—সীতা ও লক্ষ্মণ। চৌদ্দ বৎসরের বনবাস-জীবনকে কেন্দ্র করে বাল্মীকি যেভাবে তাঁর কল্পনা-শক্তিকে ছুটিয়েছেন নানা দিকে, তার কোন দিকেই না গিয়ে কালিদাস অতি সংক্ষেপে, কয়েকটি মাত্র শ্লোকে অরণ্যকাণ্ডের ছবি এঁকে যথাসময়ে সীতাহরণ-পর্ব সমাপ্ত করে দিলেন। যেখানে বাল্মীকি অনেক বলেছেন, সেখানে কালিদাস নীরবতা পালন করেছেন। আর যেখানে বাল্মীকি সামান্য দু-একটি কথা বলেছেন, সেখানেই কালিদাসের উদ্‌ভাবনী কল্পনা বলাকার পক্ষ বিস্তারে সুদূরের অভিযানে তৎপর হয়ে উঠেছে। এখানেই কালিদাসের অননুকরণ—অনুসরণের কৃতিত্ব এবং পক্ষপাতিত্বহীন কবিত্বের পরিপূরকতা।

সীতাহরণের পর রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের নায়কদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সীতা-উদ্ধারের পরিকল্পনায় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার আশ্রয় নিলেন। এবং সফলও হলেন। লঙ্কাকাণ্ডের প্রস্তুতি শুরু হ'ল। শুরু হ'ল প্রচণ্ড যুদ্ধ। অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন রামচন্দ্র। তার ফল কি হ'ল, কালিদাস সুন্দর একটি কথায় শুনিয়ে দিলেন। কবি বললেন—'ব্রহ্মমস্ত্রং প্রিয়াশোকশল্য নিষ্কর্ষনৌষধম' (১২/৯৭)। রামের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ যেন, রামের প্রেয়সী সীতা বিচ্ছেদের উদ্ধারের জন্য প্রকৃত ঔষধ প্রযুক্ত হ'ল। কীভাবে হ'ল ?—'স রাবণ শিরঃ পঙতিমজ্ঞাত ব্রণবেদনাম'। —রাবণের মুণ্ডমালা (দশটি মুণ্ড) ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রযুক্ত হয়ে ছিন্ন করল (১২/৯৯)।

কালিদাসের 'প্রিয়াশোক-শল্য নিষ্কর্ষনৌষধম' কথাটি এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, তথা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। 'প্রিয়া' যেমন এখানে রামজায়া সীতা, আবার বিশ্বপ্রকৃতি অর্থে দেশমাতৃকাকেও বুঝতে হবে। কবি এখানে নিছক অকিঞ্চিৎকর স্ত্রৈণত্বের আভাসে দাশরথির চরিত্রে সংকীর্ণতা আনতে চান নি। অত্যাচারীর অত্যাচারে দেশের যে ক্ষতি হচ্ছিল, তার নিরাপত্তা ও রক্ষার বিষয়টি 'সংকর্ষণ' কথার ভিতর নিহিত রয়েছে।

'সংকর্ষণ' অর্থাৎ ছিনিয়ে নেওয়া। 'প্রিয়াশোক' অর্থাৎ স্বাধীনতার অভাব-জনিত শোক। কবি মুখ্যার্থে এই কথা ও গৌণার্থে রামজায়া সীতার কথাই বলতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে, অযোধ্যা-রাজলক্ষ্মী সীতা কবির চোখে কত মহীয়সী, তাও বলা হয়ে গেল।

রাবণ-বধ ও সীতা-উদ্ধার সমাপ্ত করে, রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে পুষ্পক বিমানে অযোধ্যার দিকে ফিরে আসছেন—কবির ত্রয়োদশ সর্গের পথ ধরে। ঊর্ধ্বলোক থেকে কবি, রামচন্দ্রের মাধ্যমে সীতাকে বিশ্ব-প্রকৃতির মর্ত্যধাম দেখাতে দেখাতে চলেছেন। প্রাক্তন প্রেমের বিরহ বিধুর রোমন্থন চলছে 'অমর যুগলের' মধ্যে। দূরের সৌন্দর্য আর উভয়ের মাধুর্য মিশে রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ কাব্য সুষমায় ষোড়শকলা পরিপূর্ণ করেছে। মাল্যবান পর্বতের শিখর দেশে, পম্পা সরোবরের তীরে তীরে, রামগিরির অধিত্যকায়, অগস্ত্যমুনির তপোবনে—আরও রমণীয় স্থান-সমূহের প্রাক্তন স্মৃতি-বিজড়িত প্রেমমিলনের মুহূর্তগুলিকে রোমন্থন করে রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে শোনাচ্ছেন, আর দিব্য-রোমান্সের শিহরনে পুলকিত হচ্ছেন, এরই মধ্যে সুচতুর বিরহ-বিধৌত কবি-মনের প্রতিফলন ঘটল এক অনন্য শ্লোকে। কবি শোনালেন—

'অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গ নাম্নান,

অন্যোন্যদত্তোৎপল কেসরানি। দ্বন্দ্বানি দূরান্তর বর্তিনাং তে, ময়া

প্রিয়ে! স স্পৃহমীক্ষিতানি॥' (১৩/৩১)—হে প্রিয়ে! আমি যখন তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলাম, তখন ঐ পম্পা সরোবর চির সম্মিলিত চক্রবাক মিথুনের পরস্পর পদ্মকেশর দান. সতৃষ্ণ নয়নে দেখতাম। কবির ইঙ্গিত বোধের মধ্যেও বিরহের কত সূক্ষ্ম সংযোজন! সীতা-চরিত্রের অতলস্পর্শী অনুভূতি, সাহিত্যের বিমূর্ত-কৃন্তনের মধ্যে 'কনট্রাস্ট' সৃষ্টির কী অপূর্ব সুন্দর ঘটনাবিন্যাস! কী অসাধারণ শব্দ চয়ন! প্রেমের 'কনট্রাস্ট' সৃষ্টিতে অদ্বিতীয় কবি কালিদাস 'চক্রবাকের প্রেম'-কে রাম-সীতার প্রেমের সঙ্গে অসাধারণ কাব্য-সৌন্দর্যে অবিনাবদ্ধভাবেই জড়িয়ে দিলেন। কবি, অফুরন্ত শব্দ-ভাণ্ডার মন্থন করে রাম-সীতা ও চক্রবাক মিথুনের পরিপূরক বিশেষণ হিসাবে 'অবিযুক্তানি' শব্দটি চয়ন করে নিলেন। যার মধ্যে 'বিযুক্ত' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও, বিরহের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হয়ে গেছে। চক্রবাক-মিথুন, নিবেদিত প্রেমের এক অখণ্ড প্রাণ। তবু 'দিনের শেষে ঘুমের

দেশে'র অন্ধকারে তাদের বিচ্ছেদ অনিবার্যভাবেই সত্য। এবং তখন তারা 'অবিযুক্ত'। পাখির জীবনের এই সুরটিই রামসীতার ভাবীজীবনের প্রতি-সমাঙ্গে পর্যবসিত হওয়ার ইঙ্গিত, কবি কালিদাস সুচতুর কৌশলে এখানে জুড়ে দিলেন। কত কাব্যের কত শ্লোকে নায়ক-নায়িকার মিলনবার্তায় কবি 'হরিণ-যূথ', 'ময়ূর-মিথুন'—ইত্যাদির অবতারণা করেছেন। কিন্তু রাম-সীতার প্রেম মিলনে ঠিক বেছে বেছে অবিযুক্তের প্রতিরূপ চক্রবাক-মিথুনকেই এনে ফেললেন পরিণতির কেন্দ্রীয় ভাবনাকে মনে রেখে।

কালিদাস আকাশ-পথে রাম-সীতার মিলন ঘটিয়ে পৃথিবীর অপূর্ব শোভা ও অনিন্দ্যনীয় স্মৃতি দেখিয়ে ও শুনিয়ে, নিয়ে এলেন এক অপূর্ব মিলন-সঙ্গমে। যে-মিলন সাগরের মতো উদার ও অসীম, দ্বৈতাদ্বৈতের ঊর্ধ্বে। গঙ্গা-যমুনার মিলন-সঙ্গমের উপর থেকে কবি শোনালেন—

"সমুদ্রপত্ন্যোর্জল সন্নিপাতে,
পূতাত্মনামত্র কিলাভিষেকাৎ।
তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়ঃ, তনুত্যজাং নাস্তি শরীরবন্ধঃ" ॥ (১৩/৫৮)

রত্নাকারের পত্নীরূপিণী এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে যাঁরা অবগাহন স্নান করে পাপবিমুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যতই অজ্ঞান হন না কেন, দেহ অবসানের পর আর তাঁদের এই দুঃখকষ্টের সংসার ক্ষেত্রে ফিরে আসতে হয় না। কবি, রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে একথা সীতাকে শোনালেন। এই শ্লোকের মধ্যেও রয়েছে অসাধারণ ইঙ্গিতবোধ। সীতা-জীবনের দোষ ত্রুটি, অজ্ঞানতা, হৃতাপরাধ—সবই পাঠক জানেন। অশোকবনে রক্ষো কুলপতি রাবণের দুর্ব্যবহার, বন্দিনী-জীবনের অভিশাপ, সর্বোপরি অযোধ্যার তৎকালীন সংস্কারসর্বস্ব মূর্খ জনসাধারণের ভাবী প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, সীতা-পরিত্যাগ পরিকল্পনার সূক্ষ্ম বীজটি কবি "তনুত্যজাং নাস্তি শরীর বন্ধঃ"—বাক্যের মধ্যেই বেশ শক্ত-পোক্তভাবে বপন করে দিলেন। সমুদ্র অর্থাৎ রত্নাকরের মতই রামচন্দ্রের বিপুল বিশাল সত্তা। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম-মুখটি সীতার জীবনে দ্যোতিত। সমুদ্রে বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার অস্তিত্ব লোপ। সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব লোপের মধ্য দিয়ে আন্তরিক নিগূঢ়তায় সরিৎ সাগরের মহামিলন। শক্তি ও শক্তিমানের একীকরণ। তাই রাম-সীতার মিলন, দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে, সমাজ সংসারে তথা সংস্কারের ভ্রূকুটি চক্ষুর কাছে ধর্তব্যহীন এক মহামিলন। যা সাধারণ মানুষের পরচর্চা ও

ছিদ্রান্বেষণের গণ্ডির বাইরে। যা বিচ্ছেদ হলেও, পরিত্যক্ত হলেও —যার রামের সঙ্গে একবার মিলন হয়েছে, তার আর কারুর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা হয় না। তাই কবির পূর্ব-পরিকল্পিত—'তমুত্যজাং নাস্তি শরীর বন্ধঃ'-এর শরণাপন্ন হওয়া। একাধারে দৃশ্য দর্শন, পক্ষান্তরে সমস্ত সমস্যার সমাধানের সূত্র নির্ণয়। এইভাবে কালিদাস তাঁর রঘুবংশ কাব্যে সীতার নব-মূল্যায়ন করতে করতে গুহকের আশ্রম হয়ে সরযূর উপর দিয়ে এসে, রামচন্দ্রের পুষ্পক বিমানকে অযোধ্যার মাটিতে নামিয়ে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত করলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ও সমালোচক স্বর্গত অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "...সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গের মধ্যে নানা স্থানে দূরে দূরে, রাম-সীতার সম্বোধনকালে যে বিশেষণ দিয়াছেন, তার সংখ্যা মোট বারোটি এবং কথা প্রসঙ্গে রাম, আরও দুটি বিশেষণ, এই মোট চৌদ্দটি পদে, সীতা-রূপিণী স্বর্ণপ্রতিমার যে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে, শতাধিক শ্লোক-ব্যাপিনী এবং সহস্রাধিক বিশেষণ পীড়িতা কোন কোন সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার সৌন্দর্য তাহার শতাংশের একাংশও ফোটে নাই। এ অংশেও কালিদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অমিত-শক্তি।"

দুই

সীতা-সহযোগে আযোধ্যাপতি, রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। তবু দশরথের বিয়োগজনিত শোকে কৌশল্যা-সুমিত্রার রজনীগন্ধার মতো শ্বেত-বৈধব্য, সীতাকে মানসিকভাবে পীড়িত করে তুলল। জননীদের চোখের জলে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হ'ল। কিছুদিন বাদে শোনা গেল, সীতার গর্ভসঞ্চার হয়েছে। রঘু থেকে রাম পর্যন্ত সকলেই ঋষির বরে বা শাপে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কবি, সীতার ক্ষেত্রে, রামোত্তর রঘুকুল-প্রতিনিধির সম্ভাবনায় সম্পূর্ণভাবে যথা-নিয়মে, প্রাকৃতিক কারণে, বিজ্ঞানসম্মত ভাবনায় আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেন। তাই আমরা পূর্বে এক জায়গায় বলে এসেছি—'সীতা উর্বরতার প্রতীক। প্রাণস্পন্দনের এক অপূর্ব নজির।'

সীতা মাতৃত্বের অধিকারিণী হতে চলেছেন। তাই তাঁর রুচিপূরণের প্রয়োজন আছে। কবির মুখে বাণীর নৃত্যে ধ্বনিত হ'ল, 'পপ্রচ্ছ রামাং

রমণোভিলাষম্।' (১৪/২৭)।— অযোনিজা সীতা, শ্রীলক্ষ্মী-কবির কণ্ঠে 'রামা' রূপে উদ্‌গীত হলেন। কিন্তু এই রামা গোলোক-বিহারিণী নন, পদ্মাসনাও নন, আবার ধনের দেবীও নন। এই রামা অপার্থিব-পার্থিবা, এই রামা ধরণীগর্ভসম্ভূতা, প্রকৃতির বিজন বনভূমির সৌন্দর্যে উন্মাদিনী। তাই প্রাসাদের অধিকারে, স্বর্ণসিংহাসনের রাজসিকতায় বা কোলাহলমুখর নাগরিকবৃত্তির আড়ম্বর-পরিমণ্ডলে এই রামার অভিলাষ যায় না। সেইজন্য অভিলাষের আন্তরিকতায় সীতার মুখ দিয়ে শোনালেন—'ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তিগঙং ভাগীরথী তপোবনানি। (১৪/২৮)। আমার ভাগীরথী তীরের কুশাচ্ছন্ন তপোবনসমূহ দেখতে সাধ হয়। সীতার এই অভিলাষই তাঁর ভাবী জীবনের অভিশাপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।

রাজসংসারে পরিপালিতা, রাজবংশে পরিণীতা, দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিতা, অশোকবনে বন্দিনী— সর্বোপরি প্রকৃতিজা সীতা, জন্মলগ্নে তাৎক্ষণিক প্রকৃতি-মাতার প্রেম থেকে কখনও বিচ্যুত হতে পারলেন না। রাজকীয় পরিমণ্ডলে অবস্থান করেও তাঁর অনল-বিশুদ্ধ আত্মা, প্রকৃতির আত্মীয়তার কী অকৃত্রিম অনুরাগে বিজন-বন-বিহারিণীর ভূমিকা গ্রহণে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে! নাড়ীর টানে, শোণিতের সম্পর্কে, জন্মবৃত্তের আবর্তনে—স।তা-চরিত্রের কী অপূর্ব সৃষ্টি! এই ঘটনা রামায়ণে থাকলেও, ঠিক এই চিত্র সেখানে নেই—এ সম্পূর্ণ ই কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। ভাবী সীতা-পরিত্যাগের জন্য যে-প্রতিবাদ বা দুঃখ—সেই দুঃখের জন্য বাল্মীকি, কালিদাস বা নায়ক রামচন্দ্র, এমনকি সমাজব্যবস্থাও দায়ী নয়। সীতার এই দুঃখের একমাত্র দায়ী তাঁর জন্মলগ্নের মজ্জাগত, প্রকৃতি-মাতার প্রতি আত্যন্তিক প্রেম-সংস্কার। সমাজব্যবস্থা, প্রজানুরঞ্জন, অনুশাসন, সীতা-চরিত্রে রক্ষো-রক্ষিতার ক্লেদাক্ত অপবাদ—এগুলি তো নিরর্থক ঘটনা মাত্র। এগুলি তো যে-কোন মুহূর্তে আইন ও শাসনের রক্তচক্ষু প্রদর্শনের ভয় দেখিয়ে নিঃশেষ নিস্তব্ধ করা যেতে পারে। আইন পরিবর্তন করে প্রজাদের দোষারোপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সীতাকে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখা যেতে পারে। কিন্তু জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, আবাল্যপোষিত, সীতার বনতোষিণী-বৃত্তিকে কে কীভাবে আটকাবে! তাই কবির সীতা-চরিত্রে বেদনার মসীশল্য যতখানি তীব্র হয়েছে, তার থেকে বেশি তীব্রতর হয়েছে সহজ.স্বভাবের সঙ্গে চরিত্র নির্ণয়ের এক বাস্তবমুখী

তৎপরতা। এরই নাম সাহিত্য। সাহিত্য—কোন দৈব ঘটনার দ্বারা আলম্বিত প্রেরণা নয়, সম্পূর্ণই স্বভাবের বৃত্তি।

এর ঠিক পরেই সীতা পরিত্যাগের রসদ তৈরি হয়ে গেল। রামচন্দ্রের অন্যতম গুপ্তচর ভদ্র নামক ব্যক্তিটি এসে জানালেন—'অন্যত্র রক্ষো ভবনোষিতায়ঃ, পরিগ্রহাণ্ মানব দেব ! দেব্যাঃ ॥ (১৪/৩২)।' অর্থাৎ রাক্ষস-ভবনবাসিনী দেবী জানকীকে আপনি নির্বিচারে হৃদয়ে গ্রহণ করায় প্রজাসাধারণ একটু ক্ষুণ্ণ বলেই মনে হয়। ভদ্রের এই উক্তিটি রামের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল। সীতা যদি স্বয়ং রাজলক্ষ্মী হন, তবে তো সীতার অপবাদ সমগ্র অযোধ্যা রাজলক্ষ্মীর অপবাদ। রামের সেই—'প্রিয়া' শোকশল্য তো দেশমাতৃকার বিরুদ্ধেও শোকশল্য। রাবণ সীতার চরিত্র হনন করেছে, তাই প্রজাসাধারণের মধ্যে উঠেছে গুঞ্জন। স্ত্রৈণত্বের পাশে তো মহারাজ আবদ্ধ নন। তাই সীতা পরিত্যাগই স্থিরীকৃত হ'ল। আর সীতা তো ভাগীরথীর তীরবর্তী তপোবনের অরণ্যপ্রদেশে অবস্থান করার অভিলাষ জানিয়েছেনই ! তাই রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন '···প্রাপস্থ বাল্মীকি-পদং ত্যজৈনাম্ (১৪/৪৫)।'—বাল্মীকির তপোবনে সীতাকে ত্যাগ করে এস। লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য করে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে নিয়ে এলেন। সেই সুযোগে কালিদাস পাঠক-হৃদয়ে শোকের ছায়া ঘনীভূত করে সীতার জবানীতে বললেন, 'প্রিয়ংকরো মে প্রিয় ইত্যনন্দৎ'—আমার প্রিয়তম সর্বদাই প্রীতিসাধনে তৎপর। কিন্তু হায় ! অদৃষ্টের কী করুণ পরিহাস ! সীতা কিন্তু জানতেও পারলেন না—'না বুদ্ধ কল্পদ্রুমতাং বিহায়, জাতং তমাত্মণ্যসি পত্র বৃক্ষম্' —তাঁর চিরপ্রিয় কল্পতরু আজ তাঁরই ভাগ্যদোষে অসি-পত্রবৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছেন। শেষ মুহূর্তে লক্ষ্মণের কাছ থেকে সব জেনে সীতা লুপ্তসংজ্ঞা হলেন। আর কবি ধরিত্রীমাতার বয়ানে পাঠককে শোনালেন—পবিত্র ইক্ষ্বাকু বংশজাত' পবিত্রতম রামচন্দ্র তোমার পতি। সেই নির্মল-স্বভাব স্বামী তোমাকে কেন অকস্মাৎ অকারণে পরিত্যাগ করলেন?—এরূপ সন্দেহপ্রবণ হয়ে যেন লুপ্তসংজ্ঞা ভূতলশায়িনী সীতাকে তাঁর জননী ধরিত্রী-দেবী স্বয়ং নিজের কাছে টেনে নিতে পারলেন না। (১৪/৫৪)।' কবির কী ইঙ্গিতবোধ ! ভাবীকালে একদিন ধরিত্রীজননী তাঁর অভ্যন্তরে সীতাকে যে নেবেনই, তার কী সুন্দর সূক্ষ্মআভাস ! অগ্রজের আজ্ঞাবদ্ধ পরাধীন লক্ষ্মণ মাথা নিচু করে সীতাদেবীকে তার নিরুপায় অবস্থার কথা জানালে

সীতা যেকথা বললেন, তার মধ্যে দ্রৌপদীর শাণিত তেজোগর্ভ বাণী না থাকলেও—কঠোর-কোমলে জড়িত, জানকীর বাণীও সাহিত্যসৌন্দর্যে, দর্শনের গভীরতায় ও নৈতিক যুক্তিগ্রাহিতায় অত্যন্ত পেলব তীব্র হয়ে উঠেছে। জনকনন্দিনীর বাণীবদ্ধ শ্লোকগুলিতে অর্থগৌরববোধক ও পদলালিত্যসূচক যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছে তা সত্যিই উপাদেয় ও স্মরণীয়। সীতা বললেন—'হে সৌম্যদর্শন! তোমার ব্যবহারে আমি প্রীত হয়েছি। আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। বিষ্ণু যেমন তাঁর অগ্রজ তেজস্বী ইন্দ্রের অধীন, তুমিও সেরূপ তোমার জ্যেষ্ঠের অধীন, সুতরাং তোমার দোষ কি!—মধুরভাষিণী, স্বল্পবাক্ সীতা, আজ বহুদিন পর যেকথা শোনালেন তার মধ্যে কটাক্ষের প্রচ্ছন্ন সংকেত, কাউকে বুঝতে না দিয়ে যেন মাধুর্যের প্রলেপে প্রতিবাদের পতাকা উত্তোলন করল। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন—'পরবাণসিত্বম্'—তুমি পরাধীন—সুতরাং তোমার দোষ কি? সীতা কি জানেন না—যেঘটনার প্রয়োজনে, মঙ্গলের অনুরোধে, সুগ্রীবের স্বার্থে একদিন স্বয়ং রামচন্দ্রই সুগ্রীবের অগ্রজ বালিকে বধ করেছিলেন! জানকী কি ভুলে গিয়েছেন—তাঁরই উদ্ধারের জন্য, তাঁরই কোমল প্রাণের ক্ষত দূর করার জন্য, রাজনীতির সূক্ষ্ম প্রয়োগে বিভীষণের স্বার্থে একদিন স্বয়ং রামচন্দ্রই বিভীষণের অগ্রজ রাবণকে হত্যা করেছিলেন! হ্যাঁ। সীতা সবই জানেন। তবু আর কিছু করার নেই। ভাগ্যই হ'ক আর দুর্ভাগ্যই হ'ক সীতা ঈশ্বরাবতারের ভার্যা। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ভ্রাতৃত্বে ফাটল ধরতে পারে না। তাই জেহাদ ঘোষিত হ'ল সীতার কণ্ঠে। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন—'যাও শাশুড়িদের যথাক্রমে আমার প্রণাম জানিয়ে বল—তাঁদেরই পুত্রের সন্তান, আমাতে বিদ্যমান। তাঁরা যেন ভ্রূণের মঙ্গল চিন্তা করতে বিস্মৃত না হন।' ব্যথার বেদনায় নারী-অভিমান কতদূর যেতে পারে! সীতা বলতে পারলেন না, আমার সন্তান আমার মধ্যে বিদ্যমান। শুধু শাশুড়ির বাৎসল্য অনুভূতির খোঁচা দেবার জন্যই শুনিয়ে দিলেন. 'প্রজানিষেকং ময়ি বর্তমানং, সূনোরনুধ্যায়ত চেত সেতি॥ (১৪/৬০)।' সীতা-চরিত্রের এ-চিত্র রামায়ণে অনুপস্থিত। এ সম্পূর্ণ কালিদাসের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা। ঠিক এর পরের শ্লোকেই কবি সীতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়ে শমপ্রধানা মূর্তিমতী নায়িকার মধ্যে তেজের হুতাশন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। জানকী তাঁর পতিদেবতাকে অনাথ করে ছেড়েছেন।

কালিদাসের নির্ভীক প্রতিবাদমুখী, তীক্ষ্ণঅসির মতো খাপ থেকে বেরিয়ে পাঠকের সামনে ঝলসে উঠেছে শ্লেষের সুরে—

'বাচ্যস্তয়া মদ্বচনাৎ স রাজা, বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।

মাং লোকবাদ শ্রবণীদহাসী, শ্রুতস্য কিং সদৃশং কুলস্য (১৪/৬১)॥'

তোমাদের সেই নতুন রাজাকে বল—তিনি স্বয়ং অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করে সেই অগ্নিতে আমার সতীত্বের পরীক্ষা করিয়েছিলেন। আর আজ অলীক লোকাপবাদ শোনামাত্র সেই তিনিই আমাকে পরিত্যাগ করলেন। এটা জগদ্বিখ্যাত সূর্যবংশের কিংবা তাঁর মতো মহান রাজার অনুরূপ কার্য হ'ল!—যে সীতা, রামচন্দ্রকে 'আর্যপুত্র', 'প্রিয়তম'—ইত্যাদি সম্বোধনে সম্ভাষণ করতেন, সেই সীতা বললেন, কথাগুলি তোমাদের নতুন 'রাজা'-কে জানিয়ো! কারণ সীতা-নির্বাসন প্রিয়তম আর্যপুত্রের সুবিচার নয়। সীতার মুখ দিয়ে আরেক মনস্তত্ত্বের কথাও কবি শোনালেন এইভাবে—'তুমি পূর্বে, উপস্থিত রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করে আমাকে নিয়ে বনবাসী হয়েছিলে, তাই ঈর্ষা-পরতন্ত্র রাজলক্ষ্মী আজ তোমার সেই উপেক্ষার প্রতিশোধ নিলেন। (১৪/৬৩)।'

আজ এই দুঃখের দিনে সীতার মানসপটে অন্তর্দ্বন্দ্বের নানা চিন্তা বিচিত্রবর্ণে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। কবি স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সীতা-লক্ষ্মীর সপত্নী সম্পর্ক নিরূপিত করে সেই অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাসের প্রাক্‌কালীন রাজলক্ষ্মীকে উপেক্ষা করে সীতাসহ রামের বন-গমনের পরিপ্রেক্ষিতে, অধুনাতম সীতা-পরিত্যাগের সিদ্ধান্তে পুনরায় রাজলক্ষ্মী-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। কবি এই শ্লোকে নারী-চরিত্রের ঈর্ষা-জাত অন্তর্দ্বন্দ্বের যে রূপ দেখেছেন, তেমনি এই উক্তির মধ্য দিয়ে সীতার যে পতি-বিয়োগ ব্যথার অসহনীয় যন্ত্রণা, তাও পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করেছেন। সেই অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা, মৃত্যুর কামনা হিসাবে দেখা দিলেও সেই মৃত্যুর অন্তরায় হিসাবে সীতার মুখ দিয়ে কবি শোনালেন, 'তেজস্তদীয়ন্তর্গতমন্তরায়' (১৪/৬৫)—'তোমারই তেজ আমার অভ্যন্তরে গর্ভরূপে বর্তমান এবং যেটা আমার প্রাণ বিসর্জনের অন্তরায়।' ভারতীয় নারী-চরিত্রের কী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। পতির প্রতি প্রতিবাদের যত সুযোগই থাক, তবু সে পরম দেবতা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, এমনকি জন্মান্তরেও তাঁর সান্নিধ্যলাভের কী অনিন্দ্যনীয় প্রেমাকাঙ্ক্ষা! তাই প্রতিপ্রাণা সীতাও বললেন—'ভূয়ো যথা মে জননান্ত-

রেপি, ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ। (১৪/৬৬)'—তুমি ত্যাগ করেছ কর, তবু জন্মান্তরেও যেন তোমাকেই স্বামী পাই। এই শ্লোকটির প্রসঙ্গে কালিদাসবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন —'এত বড় কথা ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। কবি, এই একটি উক্তি করাইয়া সীতা-চরিত্রের বিরাট মহিমার কিয়দংশ প্রদর্শন করিলেন। সহৃদয় পাঠক, ইহার অন্যান্য অংশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন।' রামচন্দ্র-কে জানানোর জন্য লক্ষ্মণের প্রতি সীতার শেষ উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'বর্ণাশ্রম পালনই রাজার ধর্ম। সুতরাং আমি এখন, অযোধ্যাবাসিনী বলে না হই, বনবাসিনী বলে যেন তোমার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত না হই। পতির চোখে আমাকে না দেখিলে কিন্তু রাজার চোখে দেখতে ভুলো না (১৪/৬৭)।'

সীতার বেদনামথিত যুক্তিগ্রাহী আবেদন লক্ষ্মণ নীরবে ও নির্বিবাদে শুনলেন। কিন্তু প্রতিবাদে নিরুপায় লক্ষ্মণ সীতাকে তমসার তীরে, বাল্মীকির 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'-রূপ তপোবনে নির্বাসিত করে ফিরে এলেন। লক্ষ্মণের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সীতা বাণবিদ্ধ কুরীর পাখির মতো মুক্তকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন।—'চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ (১৪/৬৮)।'

সীতার এই ক্রন্দন অযোধ্যানগরীর প্রাসাদে প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত হয় নি। এই ক্রন্দনের ক্লান্ত-করুণ-রাগিণী তমসাসরযূর উপর দিয়ে বয়ে এসে দাশরথীদের অন্তর বেদনাকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল তা জানা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাধুর্য যতই গভীর হ'ক না কেন, সকলেই নিয়মের রাজত্বের হাতে বন্দী। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টির যিনি মালিক তাঁরই সব দায়, সুখ-দুঃখের যাবতীয় সত্তায়। তাই কবিকে সমবেদনার সমব্যথী হিসাবে রবে বা নীরবে কাঁদতে হয়। যে-কান্নার অশ্রু আমরা প্রকৃতির বন-বীথিকায় মূর্ত হতে দেখি সজল ভাষার আবেগে—করুণ বিলাপিনী জানকীর দুঃখে বনস্থলীও যেন কেঁদে উঠল। ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করে সীতার দিকে চেয়ে রইল। বনতরু থেকে ঝরঝর করে কুসুমরাশি ঝরে পড়তে লাগল। সারা বনটাই যেন দুঃখিনী সীতার সমবেদনায় আকুল হয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করতে লাগল (১৪/৬৯)।

প্রকৃতির সঙ্গে কবির আন্তরিক নাড়ীর টান। যেখানেই দেখা যায় বিচ্ছেদ-বেদনার দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়েছে, সেখানেই কবি সেই বিচ্ছেদের

সান্ত্বনায় বা বিচ্ছেদের একপ্রাণতায় মানবমনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। যে-সম্পর্ক যুগ-যুগান্তর হতে জন্ম-জন্মান্তরে দেহ ও মনকে ঐ প্রকৃতির প্রতীতিতেই বেঁধে রেখেছে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালীন বর্ণনা, বিরহী যক্ষের যক্ষপ্রিয়ার প্রতি আকণ্ঠ আকুলতা, বনে বনে উর্বশী সন্ধানে পুরূরবার ব্যাকুল উন্মত্ততা—সব-কিছুর মধ্যেই দেখা যায়, চেতনা-চেতনের সম্পর্কে, জড় ও চৈতন্যের কলা-কৈবল্যে বিশ্বের বিরহীর মর্মন্তুদ মর্মজিজ্ঞাসারই চরিতার্থতা প্রতি-পাদিত হয়েছে। তাই মহাকবি বিচিত্র বৈভবময় কাব্যকলায় যখনই দেখা যায় দুর্বল বা কোমল হৃদয়ের উপর কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসনের রক্তচক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে সে পুরুষই হ'ক কিংবা নারীই হ'ক—তখনই প্রাকৃতিক সমবেদনার চিত্র, বিচিত্ররূপে সখা ও মাতার মতো শুশ্রূষায় অবতীর্ণ হয়েছে। বেদনার্ত সমাজের বিরুদ্ধে প্রকৃতির কাছে নালিশ জানিয়েছে। তাই মনে হয়, কবির যুগে রাজতন্ত্রের অপশাসনের বিরুদ্ধে ভাগ্য ও প্রকৃতিই ছিল একমাত্র আদালত।

এরপরই কালিদাস একটি অপূর্ব ছায়াশ্লোক রচনা করলেন। অননুকরণীয় কালিদাস স্বেচ্ছায় রামায়ণকারের শ্লোকটিকে নিশ্চিন্ত চিত্তে এখানে গ্রহণ করে তিনি যে সত্যিই 'অননুকরণীয়', তার আরেকবার উজ্জ্বল প্রমাণ রাখলেন। সীতার মর্মন্তুদ অবস্থার পটভূমিকায় প্রকৃতির সমবেদনাজ্ঞাপন যে চিত্র কবি অঙ্কন করলেন, তাতে ব্যথার নিদানে বাস্তব শুশ্রূষা থেকে ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য প্রকট হওয়ায়ও সীতার সেই দুঃসহ বিরহিনী মনের বেদনা লাঘবের অভিপ্রায়ে কবি যে-শ্লোকে আদি কবিকে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন তা সত্যিই অভাবনীয় চাতুর্যের এক অবিস্মরণীয় কাব্যফল বলা যেতে পারে। শিল্পীকবি জানালেন—

'তামভ্যগচ্ছদ্রুদিতানুসারী, কবিঃ কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ।

নিষাদ বিদ্ধাণ্ডজ দর্শনোত্থঃ, শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ॥' (১৪/৭০)।

—নির্দয় নিষাদের দ্বারা বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে দেখে যাঁরা শোক্—'মা নিষাদ' ইত্যাদি কবিতার ধারায় বিগলিত হয়ে জগতে শ্লোকরূপে পরিণত হয়েছিল সেই আদি কবি বাল্মীকি কুশ ও ইন্ধন সংগ্রহের মানসে অরণ্যের ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। অকস্মাৎ করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনে তিনি সেদিকে গিয়ে অশ্রুপ্লুতমুখী সীতার সামনে উপস্থিত হলেন। যে মহর্ষি বাণবিদ্ধ সামান্য ক্রৌঞ্চ পাখি (কুঁচেবক) দেখে শোকে বিগলিত

হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ করুণরসবিধৃত শ্লোক রচনা করেছিলেন, সেই মহর্ষি মহাপ্রাণ আদিকবি সীতার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। পরম সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সীতা চরম আতিথ্যের সৌজন্যে আশ্রিত হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করলেন। সীতার প্রতি কালিদাসের কী মমত্ববোধ! যথাসময়ে যথা পুরুষকে যথা অসহায়ার কাছে উপনীত করেছেন। নিজে কবি বলেই তো জানেন, কবির মমত্ববোধ, মানবিকতা তথা সংবেদনশীল মনের গুরুত্ব কতখানি! উপরিউক্ত সত্তর-সংখ্যক শ্লোকে কালিদাস যেভাবে আদিকবি বাল্মীকির পরিচয় দিয়েছেন, তার সূত্রটি মূল রামায়ণ থেকে এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক কিছু হবে না। মূল রামায়ণের আদিকাণ্ডে কবি বলছেন—'সোনুব্যারণাদভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।' মহর্ষি বাল্মীকি প্রবল শোকের সময় যে 'সমাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত' (অনুষ্টুপ ছন্দ) বিপুল শোক-বাক্য গান গেয়েছেন তাই শ্লোক হয়েছে। তাই কবির মনোভূমিতে যে ফসলের ফলন হয় সেটা 'সত্য' রূপে নিত্যকাল অবস্থান করে। বাল্মীকি, কালিদাসের সার্থক উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় যথার্থই বলেছেন—'নারদ কহিলা হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি— ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' বাল্মীকি অনুগ্রহ লাভ করে সীতা তমসার তীরবর্তী আশ্রমে নিয়মিত যথাবিহিত সংযমে কাল কাটাতে লাগলেন।

যথাসময়ে বাল্মীকির আশ্রমে সীতা দু'টি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। পিতৃতুল্য বাল্মীকি তাঁর মানসকন্যার পুত্রদের নামকরণ (যথাক্রমে কুশ ও লব) ও জাত-সংস্কারাদি সম্পন্ন করলেন। পতিপরিত্যক্তা সীতা বাল্মীকির স্নেহসিঞ্চনে আশ্রমপদে পুত্রদের মানুষ করতে লাগলেন। বাল্মীকির অনুপ্রেরণায় দুই পুত্রসহ সীতা এলেন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে। রাজসূয়যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক মঞ্চে। বাল্মীকি সীতাগ্রহণের জন্য রামকে অনুরোধ করলেন। দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। তাতেও রামচন্দ্রের প্রজারঞ্জন ও লোকাপবাদ-এ দুটির ভারসাম্য রক্ষিত হ'ল না। কালিদাস বিপদ গুনলেন। বাল্মীকি উদ্বিগ্ন হলেন। কোন কবিই রাজপ্রাসাদের নাগরিক শাসন বৈভবের মধ্যে প্রকৃতির সহানু-ভূতিশীলতার কথা ভাবতে পারলেন না। তাই সব সমস্যার সমাধানে কবিকে অনেক ভেবেচিন্তে বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হ'ল। তিনি

শ্লোকে বাঁধলেন—

'সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্তৃপ্রণিহিতেক্ষণম্।

মা-মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ (১৫।৮৪)॥'—

জ্যোতির্ময়ী পৃথিবী আবির্ভূতা হয়ে দুহিতা সীতাকে নিয়ে সেই আলোক-পথে ধরিত্রীগর্ভে চলে গেলেন।

মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশের আলোকে যেভাবে সীতাকে লিপিচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ। বাল্মীকি ও কালিদাস এঁরা দু'জনেই সবদিক দিয়ে সীতাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে করে সীতা বিশ্বসাহিত্যের নায়িকায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে হতে পেরেছেন কালিদাসের পরমা-নায়িকাও।

মহাকবি কালিদাসের বিজ্ঞান-ভাবনা

ইতিহাসে কালিদাস অমর হয়ে আছেন মহাকবির অনন্য মহিমায়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা-ভাবনা অল্পমূল্যের ছিল না। তাঁর কাব্য-নাটকের বিশ্লেষণ করলে যেমন সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতির স্বাদ পাওয়া যায়, আবার তাঁর কাব্যে বিজ্ঞান-ভাবনারও নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। এই রচনায় মহাকবির বিজ্ঞান-ভাবনা সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে।

বহু প্রাচীনকালের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষরা মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝড়, রামধনু—এই প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে অপদেবতা মনে করে ভয় পেতো এবং ঐগুলির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ঐসব প্রাকৃতিক বস্তুগুলির উদ্দেশে পূজা-পার্বণাদি করত। তারা এও মনে করত, পূজা-পার্বণাদির দ্বারা ঐ অপদেবতারা সন্তুষ্ট হয় ও পৃথিবীর কল্যাণ করে। এর অনেক পরে এল বৈদিকযুগ। সেই বৈদিকযুগের সনাতন ঋত্বিকগণ ধ্যানবলে সমগ্র নৈসর্গ-তত্ত্বে অবগত হয়ে বিশ্ববাসীকে জানালেন, মেঘ, বৃষ্টি-দেবতা ইন্দ্রের সৈন্য এবং এই মেঘের বা পর্জন্যদেবের বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা যথারীতি পূজার বিধি-ব্যবস্থাও সমাজ-জীবনে প্রচলিত হয়ে গেল। প্রাচীন সমাজে মেঘ ভীতিকর অপদেবতা থেকে প্রীতিকর দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও তার দৈবতত্ত্বের স্বীকৃতি পেল এইভাবে চলল বহু শতাব্দী।

তারপর এল লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ। সেই যুগ-প্রবাহে অশ্ব-ঘোষ, ভাসের মতো মহান কবি ও নাট্যকারগণও নৈসর্গ-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় নতুন কিছু শোনালেন না। সংস্কৃত সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটল মহাকবি কালিদাসের। তিনিই নিয়ে এলেন অচিন্ত্যনীয় এক অভিনবত্বের বারতা। তাঁর কাব্য-নাটকের নানা অংশে যুক্তি-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্রাগ-যুগীয় সাহিত্যতত্ত্বে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করলেন। সেই পরিবর্তনের পরিব্যাপ্তি ঘটল সাহিত্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে।

আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের প্রমাণিত পরীক্ষায় আমরা জেনেছি, সূর্যের

তাপে পৃথিবীর জল বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে এমন এক বায়ুমণ্ডলের স্তরে চলে যায়, তখন বাষ্প উক্ত বায়ুমণ্ডলের সমতাপমাত্রায় মিশ্রিত হয়ে আর ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, তখন ঐ বাষ্পই মেঘে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলীর চাপে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসে।

মেঘসৃষ্টির এই আধুনিক বিজ্ঞান-বার্তা, দর্শন-পুরাণ-লালিত যুগের কবি কালিদাস অবগত ছিলেন। সেই যুগের অন্যান্য কবিদের মতো মেঘ মানব-সমাজের অপদেবতা বা প্রসন্ন উপকারী বন্ধু বা বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্রের সৈনিকরূপে কালিদাসের কাছে দেখা দেয় নি। তিনি মেঘের এই বিজ্ঞানতথ্য-নির্ভর সত্তাকে বিজ্ঞানী দৃষ্টি দিয়েই গ্রহণ করে তাঁর কাব্য-সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। মহাকবির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রঘুবংশের প্রথম সর্গের আঠারো-সংখ্যক শ্লোকে, মহারাজ দিলীপের রাজ্য শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক গ্রহণ সম্বন্ধে বলছেন, তিনি (মহারাজ দিলীপ) প্রজাদের হিতসাধনের জন্যই তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করতেন। সূর্য যেমন সহস্র গুণ জল ফিরিয়ে দেবার জন্যই পৃথিবীর রস গ্রহণ করে থাকে। সহস্রগুণ মুৎস্রষ্টমাদতে হি রসং রবিঃ (রঘু ১/১৮)। উক্ত কাব্য-গ্রন্থের দশম সর্গে রাজা দশরথের মহিষীদের গর্ভধারণ-বার্তা জানিয়ে বললেন, সূর্যের অমৃত নামক কিরণজাল যেমন জলময়-গর্ভধারণ করে, রাজা দশরথের তিন পত্নীও সেইরূপ প্রজাদের মঙ্গলের জন্য দেবাংশ সম্ভব গর্ভধারণ করলেন (র-১০/৫৮)। এরপর ত্রয়োদশসর্গে রামচন্দ্র সীতা-উদ্ধার করে পুষ্পক-বিমানে যখন অযোধ্যায় ফিরছেন তখন সমুদ্রের কথা বলতে বলতে সীতাকে জানালেন, সূর্যের কিরণমালা এই সমুদ্র থেকেই জলময়-গর্ভধারণ করে আবার বৃষ্টিরূপে ধরাতল সিক্ত করে। গর্ভং দধত্যর্ক মরীচয়োস্মাদ বিবৃদ্ধি মাত্রা-স্বাবতে বসূনি (র-১৩/৪)।

কবির মেঘসৃষ্টির বিজ্ঞান-ভাবনা কেমন করে ধাপে-ধাপে মেঘের যাত্রাপথে রূপান্তরিত হয়েছে তাও তিনি শোনালেন মেঘদূত কাব্যের মধ্য দিয়ে। পূর্বমেঘের পঞ্চম শ্লোকে কবি বলছেন—বাষ্প, তাপ, জল ও বাতাস এদের মিলনে উৎপন্ন মেঘই বা কোথায়, আর সমর্থ ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণিদের দ্বারা প্রেরণযোগ্য সংবাদই বা কোথায়? মেঘ তো জড় পদার্থ। তাকে প্রার্থনা জানানো সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। তাই কবি তাঁর বিজ্ঞান-ভাবনাকে অকাট্য করার জন্য বললেন—কামার্তা হি প্রকৃতি-

কৃপণাঃ চেতনাচেতনেষু। যক্ষ কামার্ত। তাই সে কামের প্রাবল্যে অস্থির-মস্তিষ্ক, সেইজন্যই উত্তরগামী মেঘকে সে দূতরূপে বরণ করে চেতন-অচেতনের সীমা নিধারণ করতে পারল না। উত্তরমেঘের বত্রিশ-সংখ্যক শ্লোকে কবি বলছেন—যক্ষপ্রিয়ার বিশুষ্ক-বিরহমূর্তি দেখে মেঘ স্থির থাকতে না পেরে যেন বিরহ-বেদনায় কেঁদে না ফেলে, কারণ, মেঘের হৃদয়টাও তো খুব কোমল। তাই জলময় মেঘ পরের দুঃখে গলেও যেতে পারে। এর আসল কথাটা কিন্তু বিজ্ঞানী-দৃষ্টির যুক্তিতে প্রকট। চলন্ত মেঘ প্রায়ই কোন না কোন স্থানে বিশেষ করে পর্বতগাত্রে থেমে গেলে এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। তাই যক্ষপ্রিয়ার শুষ্করূপ দেখার জন্য স্থির মেঘ থেকে যদি একটু-আধটু বৃষ্টি হয়ও, সেটা যক্ষপ্রিয়া-রূপ নিদাঘ-তপ্ত বসুন্ধরার কাছে আষাঢ়ের প্রথম শীতল-সিঞ্চনের শান্তি এনে দেবে, আবার স্থির মেঘ যে বৃষ্টিপাত ঘটায়, এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাটাও কবির কাছে কিন্তু অজ্ঞাত ছিল না।

এখন দেখা যাক কালিদাস রামধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কী বলেছেন। আকাশোস্থিত রামধনু প্রসঙ্গে আমরা যে পৌরাণিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যাটি পেয়েছি সেটা হ'ল, রামধনু বা ইন্দ্রধনু পর্জন্যদেব ইন্দ্রের এমন একটি সায়ক বা তীর যেটা আপনা থেকেই মেঘ-সংলগ্ন উপরিভাগে প্রকাশমান হয় তখনই, যখন মহিমান্বিত ইন্দ্রদেব সেই শরটি নারকীয় রাজ্যের সম্রাট দেব-অরি বিরোচনপুত্র দৈত্য বলির বিনাশে নিক্ষেপ করে থাকেন।

রামধনুর অবৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিকী বার্তার এটাই অতিপ্রাকৃত মত-বাদ। কিন্তু পুরাণ-প্রচলিত সামাজিক মতবাদকে মহাকবি কালিদাস তাঁর শিল্পকলার ভিতর গুরুত্ব দেন নি, গ্রহণও করেন নি। তিনি সেই অতি-প্রাকৃত মতবাদকে দূরে সরিয়ে রেখে আমাদের শোনালেন—'রত্নাছায়া ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ। বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ড-মাখণ্ডলস্য (পূর্বমেঘ/১৫)।'

মেঘদূতের উপর বাংলায় অনুবাদসহ যে-ক'টি আলোচনা-গ্রন্থ আছে সব-ক'টিতেই শ্লোকটির বঙ্গানুবাদের মূলার্থ ধরা হয়েছে এইভাবে—'বিভিন্ন বর্ণের রত্ন সম্মিলিত হয়ে যেমন সুন্দর দেখায়, তেমনি সুন্দর ইন্দ্রধনু ঐ পর্বতের উপরিস্থিত উইমাটির স্তূপ থেকে কেমন ধীরে-ধীরে উঠছে। —এই বঙ্গানুবাদটি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান-বিরোধী। সকলেই

বল্মীক কথার অর্থ উইমাটির স্তূপ বানিয়ে কবির বিজ্ঞান-ভাবনাটিকে ওলোট-পালোট করে দিয়েছেন।

কালিদাস, রামধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে জানতেন সেটা 'রঘু'-'মেঘে'-র বহু পূর্বে 'কুমারসম্ভব' কাব্যেই জানিয়ে দিয়েছেন। হিমালয়কন্যা বিবাহবাসরে মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন—'সূর্য অস্তমিত বলে নির্ঝরের পার্বতীর জলকণায় আর সূর্যকিরণ পড়ছে না, সূর্য অনেক দূরে, তাই তোমার পিতার (হিমালয়ের) জলপ্রপাতগুলির চারিদিকে আর নয়নরঞ্জন ইন্দ্রধনুর সে-শোভা দেখা যাচ্ছে না।—"শীকর ব্যতিকরাং মরীচিভিঃ দূরয়ত্যবনতে বিবস্বতি (কু-৮/৩১)"—আবার মেঘদূতের—'বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য"—এই শ্লোক দুটির তুলনামূলক আলোচনা করলে রামধনু-সৃষ্টির একটি বিজ্ঞানসম্মত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কুমারসম্ভবের শ্লোকে কবি স্পষ্ট করেই শোনালেন, সূর্যের কিরণ-স্পর্শে নির্ঝরের জলকণাগুলিই ইন্দ্রধনু রচনা করেছিল, আর সূর্যের অস্তমিত অবস্থা বলে জলপ্রপাতের জলকণা ও সূর্যরশ্মি স্পর্শশূন্যতা হেতু ইন্দ্রধনু অদৃশ্য হয়েছে ; সুতরাং কালিদাসের বিজ্ঞান-ভাবনায় সূর্যরশ্মি ও জলকণার স্পর্শহেতু বায়ুমণ্ডলে ইন্দ্রধনু বা রামধনু উত্থিত বা দৃশ্য হয়ে থাকে।

ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। ইন্দ্র অর্থে আবার জলও হয়। সামবেদের ঐন্দ্রকাণ্ডে ৯২০, ৯৫৩, ২৯৭ সংখ্যক মন্ত্রে এবং ঋকবেদের বিভিন্ন মন্ত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়। মেঘদূতের শ্লোকের অংশ 'আখণ্ডলস্য' কথার অর্থ ইন্দ্রস্য। অর্থাৎ ইন্দ্রের বা জলের। 'প্রভবতি ধনুঃ খণ্ড' কথার অর্থ আংশিক ধনু (অর্ধবৃত্তাকার) উৎপাদিত হচ্ছে বা উঠছে। 'বল্মীকাগ্রাৎ' —অর্থাৎ বল্মীকের অগ্রভাগ থেকে। পূর্বে গমন করা অর্থে অগ্র কথাটি ব্যবহৃত হয়। সেই বল্মীকের অগ্র থেকে জলের স্পর্শহেতু আংশিক রামধনু সৃষ্টি হচ্ছে। এখন দেখতে হবে বল্মীক কথার আর কী অর্থ হতে পারে। সকল ভাষ্যকারই তো উইমাটির স্তূপ খুঁজেছেন। বিখ্যাত অভি-ধান অমরকোষ বল্মীকের ব্যাখ্যা হিসাবে বলীক শব্দ থেকে নিশ্চয়েণ ধরতি জলমূচ্ অর্থাৎ জলধর মেঘ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছে।

কিন্তু মজার বিষয় দ্বাদশ শতাব্দীর বল্লভদেব তাঁর কোষান্তরে জানিয়ে ছেন, বল্মীকের বিভিন্ন অর্থ। তার মধ্যে একটি সূর্য। বামল্লরে গিরেঃ শৃঙ্গে বল্মীক পদমিষ্যতে। বল্মীক সাতপো মেঘো বল্মীকঃ সূর্য ইত্যপি। —বল্লভদেবের এই বক্তব্যের অর্থ—বামল্লর নামক পর্বতের শৃঙ্গে যে

উইমাটির স্তূপ তাকে বল্মীক বলা হয়, সূর্যের আলোযুক্ত মেঘকে এবং সূর্যকেও বল্মীক বলা যেতে পারে।—বল্লভদেবের এই অনুসন্ধানের মূলে কালিদাসের মেঘদূতের এই শ্লোকটিই যে উৎস হিসাবে কাজ করেছে সেটার স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে বলেই মনে হয়। অবশ্য নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত এই কথা বল্লভদেবের পূর্বে আলোচনা করেছেন ঠিক, কিন্তু বল্মীকের অপর অর্থ যে সূর্য, সেকথা তিনি বলেন নি। সুতরাং বল্মীক যদি সূর্য হয় তবে তার অগ্রগামী বস্তু হ'ল রশ্মি। এখন মেঘদূতের—'বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য' কথার অর্থ দাঁড়াল—সূর্যের রশ্মি থেকে জলকণার প্রভাবে আংশিক রামধনু উত্থিত হয়েছে।

বর্তমান যুগের অগ্রগণ্য ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, কালিদাসের প্রয়োগ (মেঘদূত ১৫) থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে শব্দটির উইঢিপি অর্থ নয়। ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দটি বৃ অথবা বল্‌ ধাতু থেকে উৎপন্ন। মানে আবৃত করা, বেষ্টন করা। সংস্কৃত বর্মন্‌, বল্লী, বলয় ইত্যাদি শব্দ তুলনীয়। তাহলে বল্মীক শব্দের আসল মানে ছিল ঝোপঝাড় লতাপাতার বেষ্টন এবং তার থেকে হয়তো ছুঁচোর গর্ত বোঝাত। এই শেষের অর্থ থেকেই উইঢিপি মানে অনুমিত হয়েছিল। এখানে লক্ষ করা যায় ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যেও বল্লভদেবের বল্মীক কথাটি ধরা পড়ে নি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের বিজ্ঞান-ভাবনাটিও তাঁর বল্মীক শব্দের ব্যাখ্যার ভিতর অনুমিত হতে পারে নি বলেই মনে হয়।

কালিদাস একথাও জানিয়েছেন, রামধনুর বর্ণ সাতটি এবং ঐ সাতটি বর্ণ সূর্য থেকেই আহৃত। এই সাতটি বর্ণকে বলে 'সপ্তসপ্তি' (সোলার স্পেক্ট্রাম)। মহাকবি তাঁর আপনার অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে মাতলির কণ্ঠে মহারাজ দুষ্মন্তকে শোনাচ্ছেন—সেই দুর্জয় দানবরা আপনার বন্ধু দেবরাজের পক্ষে অপরাজেয়, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের আপনিই বধ করবেন ; রাত্রিকালে সূর্যের অভাবে চন্দ্রই যেরূপ সকল বস্তুর দৃশ্য-সহায় হয়ে ওঠে আপনিও সেইরূপ ইন্দ্রভূত সপ্তবর্ণ বেষ্টিত রামধনুরূপ রথে আরোহণ করে যাত্রা করুন (শকু-৬/৩০)।

এরপর কালিদাসের সাহিত্যে মেঘে কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তার আলোচনা করা যাক। মহাকবি রঘুবংশের ত্রয়োদশসর্গে মেঘে

বিদ্যুৎপ্রবাহের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন—যেটা বৈজ্ঞানিক যুক্তির একটি সর্ববাদীসম্মত অভিমত। পুষ্পক-বিমানে করে রাম-সীতা আকাশপথে তীব্র গতিতে চলেছেন। তাঁদের যাত্রাপথে পুষ্পক কখনও মেঘের উপর দিয়ে, কখনও বা মেঘের তলদেশ দিয়ে আবার কখনও বা মেঘকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গন্তব্যস্থলের অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ একটি ঘটনার মাধ্যমে রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে কবি আমাদের শোনালেন, হে সীতা! তুমি কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পুষ্পকের বাতায়ন পথে হাত বাড়িয়ে মেঘ স্পর্শ করাতে, মেঘ ও তোমার হাতের সংঘর্ষে বিদ্যুৎ-প্রকটিত হয়ে তোমার হাতে সেই বিদ্যুৎ-বলয় যেন দ্বিতীয় বলয়াভরণ পরাচ্ছে (রঘু ১৩/২১)। সীতা পুষ্পক-যান থেকে হাত বার করায় মেঘ স্পর্শ অনুভব করেছেন। মেঘ ও হাতের সংঘর্ষে তাঁর হাতে উজ্জ্বল, বিস্ময়কর বিদ্যুৎ জড়িয়ে যাওয়ায় তিনি বিশেষ ভীতা, চমকপ্রদা ও রোমাঞ্চিতা হয়েছেন।

বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টির এই চিন্তা আমাদের কবির মুখ থেকে আরও স্পষ্টতর ভাষায় শুনেছি তাঁর অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে। যখন ইন্দ্রসখা মহারাজ দুষ্মন্ত ইন্দ্র-দানব যুদ্ধে দানব নিধন করে বিমানপথে পৃথিবীর দিকে নেমে আসছেন তখন (সপ্তমাঙ্ক) তিনি তাঁর সারথি মাতলিকে বলেছেন—এই দেখ, মেঘ-নিঃসৃত জলকণায় তোমার এই রথের চাকার প্রান্তগুলি কেমন সিক্ত হয়ে গিয়েছে। আর চাকার শলাকাগুলির ফাঁক দিয়ে চাতক পাখিগুলি কেমন বেরিয়ে আসছে—বিদ্যুতের চঞ্চল প্রভায় রথের অশ্বের দেহ মিশে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে রথ নিশ্চয়ই জলময় মেঘের ভেতর দিয়ে চলেছে (শকু/৭ম অঙ্ক)। এই অনুমান—শুধু অনুমান বলি কেন, প্রত্যক্ষ ন্যায়ানুমানের ভিত্তিতেই কবি, মহারাজ দুষ্মন্তের ধী-শক্তিকে বিজ্ঞানী-দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে পাঠককে জানালেন, মেঘের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিতে রথ ধাবিত হওয়ায় মেঘ ও রথাশ্ব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ঘর্ষণশক্তির সহজাত নিয়মেই ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। মহাকবির সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-ভাবনার কী সুন্দর উদাহরণ। সেই সুদূর অতীতে (সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দী) কালিদাস জেনেছিলেন ঘর্ষণশক্তিই বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎস।

কবি এই প্রগতিশীল বিজ্ঞান-ভাবনা রঘুর ত্রয়োদশে ও শকুন্তলার সপ্ত-মাঙ্কে ভারতের দুটি মহান বংশের (সূর্য ও চন্দ্রবংশ) দুই মহান সম্রাটের

বক্তব্য হিসাবেই তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। অযোধ্যার রামচন্দ্র ও হস্তিনাপুরের দুষ্মন্ত এই দুই মহারাজের মুখ দিয়ে এইরূপ উন্নত বিজ্ঞান-ভাবনার সূত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক—কালিদাসের সমকালীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে নিশ্চয়ই আকাশ-যান বা বিমান বর্তমান ছিল ; না থাকলেও অন্তত বেলুনে বাতাস ভরে গগন-বিহারের সময়ে বেলুনে-মেঘে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টির প্রামাণ্য উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তা না হলে বৈজ্ঞানিক চিন্তার এত সমৃদ্ধি ও বিস্তার কবির কাব্যে, বিশেষ করে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ প্রেমিক কবির কাব্যে ধরা পড়ল কি করে?

সেই পঞ্চম শতাব্দীতে একবার বিদ্যুৎপ্রবাহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা সাহিত্য-ভাবনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে দেখলাম। । তারপর দীর্ঘ তেরশো বছর সকলেই চুপ করে রইলেন। কালিদাসের আনুমানিক কাল থেকে দীর্ঘ তেরশো বছর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পাশ্চাত্ত্যদেশে তথা সমগ্র পৃথিবীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টির আবিষ্কারক হলেন। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে একদিন স্যার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একটি পোস্টের সঙ্গে সিল্ক সুতো বেঁধে সুতোর অপর প্রান্তে একটি ঘুঁড়ি বেঁধে উড়িয়ে দিলেন আকাশে। মেঘলা আকাশে ঘুঁড়ি ওড়াবার সময় হঠাৎ তিনি দেখলেন, সুতোর সঙ্গে মেঘের স্পর্শে সুতো থেকে জ্বলন্ত প্রভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তিনি ঐ সুতো স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙুলে বিদ্যুৎবহ্নি তাঁকে রোমাঞ্চিত করে তুলল। তারপর সেই সূত্র ধরেই তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই মেঘ থেকে সংঘর্ষ প্রভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, তা স্থির করে ফেললেন। বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টির এই পর্যন্ত অনুসন্ধান মহাকবি কালিদাসও করে গেছেন। তারপর অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে লাইটনিং কনডাক্টার—এক ধরনের বিশেষ চৌম্বক শক্তি-সম্পন্ন লৌহের আবিষ্কার করে প্রমাণ করলেন, মেঘ থেকেই ঘর্ষণ শক্তির প্রভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে বিদ্যুৎ পৃথক হয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আশ্চর্য, বিশ্বকলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ মহাকবিকে বিজ্ঞান-ভাবনার আঙ্গিক থেকে কখনও বিচার করলেন না।

গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় নিশ্চয়ই কোন না কোন আকাশ-যান বা বেলুন ব্যবস্থার একটি পথ আবিষ্কার হয়েছিল।

তা না হলে উর্ধ্ব থেকে পৃথিবীর বর্ণনা শুধু কল্পনার দ্বারা সম্ভব হয় না। অন্যান্য বর্ণনা সম্ভব হলেও অন্তত এই বর্ণনা সম্ভব নয়। মহাকবি রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে বলছেন—হে হরিণাক্ষি সীতে, ঐ দেখ আমরা যতই সমুদ্র থেকে দূরে চলে আসছি, মনে হচ্ছে যেন বনানীপূর্ণ ধরণীও ততই সাগর থেকে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করছে। ইতিপূর্বে যেন সেটা সাগর অঙ্গেই মিলিত ছিল (র-১৩/১৮)। এই বর্ণনার মধ্যে তিনটি জ্যামিতিক পরিকল্পনা বিদ্যমান। প্রথমত সমুদ্রদিগন্তের সমতলভূমির চিন্তা, দ্বিতীয়ত স্থলভূমির সমতল স্তর ও তৃতীয়ত আকাশ-যানের তীব্র গতিবেগ জ্ঞাপন। এখানে কবি বলতে চাইছেন, পৃথিবী সমুদ্র বস্তুত-পক্ষে স্থির, কিন্তু পুষ্পকের গতিবেগ অস্থির। আমরা জানি, চলমান বস্তু থেকে স্থির বস্তু ও দৃশ্যগুলিও চলমান দেখায়। অর্থাৎ যেদিকে চলমান বস্তুটির গতি তার ঠিক বিপরীত মুখে যেন স্থির বস্তুগুলির গতি। এটাই পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতা ও গোলাকারের প্রাথমিক ব্যাখ্যা। কবি কালিদাস স্বকীয় চিন্তাতেই এই ব্যাখ্যা বহু পূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন।

কালিদাসের বিজ্ঞান-ভাবনার বিমান-বিষয়ক আলোচনা দেখে যদি কেউ মনে করেন, ভারতের কবির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে আলোচনাটি ঠিক তথ্যনির্ভর হয়ে উঠছে না—সে-ক্ষেত্রে আমাদের ধারণার স্বপক্ষে সমর্থনস্বরূপ উক্ত বিষয়ের উপর কিছু দেশীয় ও বহির্দেশীয় তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে। রামায়ণের পুষ্পক-বিমান পর্ব সকলেরই বিশেষ জ্ঞাত ও পরিচিত বিষয়। রাবণ তাঁর বৈমাত্রেয় অগ্রজ কুবেরের কাছ থেকে ঐ পুষ্পক-যানটি ছিনিয়ে এনেছিলেন—যেটাকে এখন হাইজ্যাক বলা হয়। পরবর্তীকালে লঙ্কাবিজয়ের পর বিভীষণের সৌজন্যে রামচন্দ্র পুষ্পক-যানটি প্রাপ্ত হন। প্রাক্ কালিদাস-যুগের কবি ভাসের 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ন' নাটকে দেখা যায়, এই পুষ্পক-যানের শৈল্পিক-সংস্কার রাজা উদয়ন সাধিত করেছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর "বৃহৎকথা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যবনরা (গ্রীক) বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. এ বি কীথ বলেন—

"Moreover it was pointed-out that YAVANS appear in the *Brihatkatha* as artists, as excellent makers of couches and even of aerial mechines an idea reminding us of the tame ot·the treatise on mechanics ot Heron ot Alexandria."

এ ছাড়া সপ্তম শতাব্দীর কনৌজরাজ শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত বানভট্টের সময় চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাং-এর বর্ণনাতেও পাওয়া যায়, চণ্ডিপতি নামে এক যবন একটি আকাশ-যান নির্মাণ করেন। বলে রাখা প্রয়োজন, যবন বলতে শুধু গ্রীককেই বোঝায় না, যবন ভারতীয় অনার্য শাখারও অন্তর্গত।

'শব্দতরঙ্গ' সম্পর্কেও কবির আলোচনা বিজ্ঞান-স্বীকৃত। শব্দ আকাশের বিষয় এবং শব্দের গুণ বিশ্বব্যাপী—এই চিন্তা কালিদাসের কাব্যে ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতেও বিধৃত। শকুন্তলা নাটকের নান্দীশ্লোকে কবি বলেছেন—"প্রশ্রুতি বিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্যবিশ্বম।" অবশ্য শব্দ তরঙ্গের ব্যাখ্যা কালিদাসের বহু পূর্বেই ভারতীয় ন্যায়দর্শনে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে, যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রের পরিপন্থী নয়।

কালিদাসের কাব্যে বিজ্ঞান-ভাবনার অবকাশ আছে। কবির বিজ্ঞানভাবনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম একটি পরিলেখ প্রস্তুত করেছিলেন স্বনামধন্য সংস্কৃতাধ্যাপক পরমেশ্বরপ্রসাদ শর্মা। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যানু-রাগিবৃন্দ কালিদাসের বিজ্ঞান-ভাবনা বিষয়ে আরও ব্যাপক চিন্তা করলে, মনে হয়, কালিদাসীয় সাহিত্যে একটি নতুন দিকের উন্মোচন হতে পারে।

সরযূ: গৌরবে ও অপমানে

আদি কবি বাল্মীকি, রামায়ণের ভূমিকাপর্বে সরযূর একটি সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বামিত্র মুনি, রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে পরন্তুমারীচ ও সুবাহু নামে ইচ্ছারূপী দুই রাক্ষসকে বধ করার জন্য যখন যাত্রা শুরু করেছেন, তখন পথে গঙ্গার তরঙ্গ সংক্ষোভ-ধ্বনি শুনে রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই জলধ্বনি কিসের?' প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র জানালেন—"ব্রহ্মা কৈলাশ পর্বতে মনের দ্বারা একটি সরোবর নির্মাণ করেছিলেন। মনের দ্বারা সৃষ্ট সরোবর বলে সেটা মানস সরোবর নামে খ্যাত। সেই সরোবর থেকে একটি নদীর উৎপত্তি হয়েছে। সেই নদী অতি পুণ্যতমা এবং সরোবর-জাত বলে, তার নাম সরযূ। এই সরযূ অযোধ্যার ভূমিকে পবিত্র ও সিক্ত করে জাহ্নবীতে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। ঐ নদী দুটির মিলন-মুখে যে তরঙ্গ-সংক্ষোভ—এ তারই শব্দ। এই সরযূ ও জাহ্নবী অত্যন্ত পুণ্যতোয়া নদী। তোমাদের দেশ তথা বংশের মাতৃস্বরূপা। ঐ দুই নদীকে তোমরা বিনম্র-সংযত চিত্তে প্রণাম কর।" মুনি-নির্দেশে, রাম-লক্ষ্মণ ঐ দুই নদীকে প্রণাম করলেন। সরযূর প্রথম পরিচয়েই দেখা গেল, রামচন্দ্রের মতো মহান ব্যক্তিত্বেরও সে প্রণম্য।

মহারাজ দশরথ বহু বছর নিঃসন্তান ছিলেন। কোনও এক বসন্ত-কালে এই অপুত্রক দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ইচ্ছে হ'ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেবতুল্য-তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আহ্বান জানিয়ে মাথা নিচু করে ভক্তিভরে বললেন—"হে দেব, আমার বংশবৃদ্ধির জন্য আপনি যজ্ঞের ব্যবস্থা করুন! এই যজ্ঞ হবে সরযূ নদীর উত্তর তীরে, যেহেতু কোশলরাজবৃন্দের মাতৃস্বরূপা সরযূ, সেই হেতু সরযূর তীরে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে, আমাদের বংশের মাতৃস্বরূপা সরযূর আশীর্বাদে আমার পুত্রাদি হলেও হতে পারে।" তারপর সারথি সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলেন—"বেদ-পারঙ্গম, ব্রহ্মবাদী-ঋত্বিক, সুযোগ্য-বামদেব, জাবলি, কাশ্যপ এবং কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে এই সরযূর তীরে শীঘ্র নিয়ে এস।"

আজ্ঞাবাহী সুমন্ত্র, সেইসব মনীষী, মুনি-পুঙ্গবদের সেই সরযূর তীরে নিয়ে এলেন। তাঁরা এসে প্রথমেই সরযূকে অবনত মস্তকে আন্তরিক শ্রদ্ধায় প্রণাম জানালেন। তারপর বললেন—"সরযূর তীরে যখন যজ্ঞভূমি নির্মিত হয়েছে, তখন আপনি অবশ্যই পুত্রাদির জনক হবেন।" দশরথের পিতৃত্বলাভের পেছনে, শাপে বর-এর প্রবাদ, পক্ষান্তরের বিচারে সত্য হলেও, আপ্তবাক্যই কিন্তু মিথ্যা হয় না। তাই সরযূর প্রতি আপ্তজনের আস্থা, আপ্তবাক্যের উৎস হিসাবেই কাজ করেছিল।

রামায়ণের মহানায়ক রামচন্দ্র সরযূ সম্বন্ধে এক জায়গায় বলছেন—"সরযূ আমার পিতৃপুরুষের ধাত্রী ও আমার উপমাতার মতো। এই সরযূকে আমি যখনই দেখি, তখন এর সিক্তপ্রবাহ যেন আমার অন্তরের উৎসঙ্গতলে স্তন্য দুগ্ধের মতো তৃপ্তি দেয়, শান্তি দেয়, শক্তি দেয়। তাই তো সরযূর দর্শনে আমার মন শ্রদ্ধায় ও আনন্দে ভরে উঠে—মাথা হয়ে যায় অবনত।"

রামচন্দ্রের জন্ম-মৃত্যুর বৃন্তে সরযূ সংযুক্তা। তাই বহু পরে, উত্তর-কাণ্ডে রামের মহাপ্রস্থানের প্রস্তুতিতে আমরা সরযূকেই দেখতে পাই রামের আশ্রয়দাত্রী হিসাবে। দেহান্তরের যাত্রায় পরব্রহ্মকে ধ্যান করতে করতে পায়ে হেঁটে রামচন্দ্র চললেন সরযূ অভিমুখে। তাঁকে অনুসরণ করল বানর, রাক্ষস আর অসংখ্য প্রজাসাধারণ। সবাই এসে উপস্থিত হ'ল সরযূর তীরে। সরযূর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, রামচন্দ্রকে বললেন—"তোমাদের সনাতন দেহের শোণিত-প্রবাহ সরযূর স্রোতে নিহিত। দেববংশের পিতামহ-সৃষ্ট সরযূতে, ধর্ম-ইতিহাস-পুরাণের মহাতীর্থ সরযূতে—হে রঘুকুলপ্রদীপ, তুমি মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাও!" সরযূর পুণ্যসলিলে রামচন্দ্র দেহান্তরের অনন্তযাত্রায় লীন হয়ে গেলেন। সরযূর তরঙ্গধারায় সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল।

এ তো হ'ল কাব্য-মহাকাব্যের কথা। এখন বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ থেকে একটি কথার উল্লেখ করে সরযূ-গৌরব শেষ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের চৌষট্টি সূক্তের নবম-সংখ্যক মন্ত্রে গয় ঋষি বলছেন—"সরস্বতী, সরযূ ও সিন্ধু—এই সকল মহা-তরঙ্গশালিনী, প্রবাহশালিনী নদী আমাদের রক্ষা করুন। জল প্রেরণ-কারিণী-জননীস্বরূপা এই সকল নদী আমাদিগকে ঘৃততুল্য, মধুতুল্য, জলদান করুন!"

অসামান্য পুণ্যালোকে সমুজ্জ্বল সরযূর এই স্নিগ্ধ গৌরব-সংবাদের মধ্যে একটা বেদনার ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। যদিও সেই ইতিহাস ব্যভিচার-সৃষ্ট, অনাচার-প্রসূত ও রাজবংশোচিত গৌরবের বিপরীত-গতিতে পরিবর্ধিত, তবু এই কলঙ্কের ইতিহাসটা না জানতে পারলে একটা রাজবংশের পতনেব কারণগুলির অন্যতম কারণটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে বিচার করা যাবে না।

সরযূ-সলিলে রামচন্দ্র তো লীন হয়ে গেলেন। অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে অভিসিক্ত হলেন রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ কুশ। কুশ মহারাজ হওয়ার আগেই বাল্মীকির রামায়ণ শেষ হয়ে গেছে। তারপর মহারাজ কুশ থেকে আরম্ভ করে আরও বাইশজন নরপতি সূর্য-বংশের রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছিলেন। সে-কাহিনী রামায়ণে নেই। রামায়ণকে অবলম্বন করে পৃথিবীর আরেকটি শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হ'ল শিল্পী-কবি কালিদাসের হাত দিয়ে। সেই কাব্যের নাম 'রঘুবংশ'। মহারাজ কুশের রাজ্যাধিকারের সূচনাতেই শুরু হ'ল রঘুবংশের লঘুযাত্রা। সূর্যবংশের নিষ্প্রদীপ অবস্থা। হতশ্রী রাজধানীর হত-গৌরব মহারাজ কুশ, গ্রীষ্মকালে স্নিগ্ধতার প্রয়োজনে সরযূর কথা চিন্তা করলেন। সরযূর স্নিগ্ধ-সলিল নিদাঘের নিরসনে বড়ই উপভোগক্ষম।

যে চিন্তা, সেই কাজ। কিন্তু একা নয়। চাই বনিতা-বেষ্টিত বিহার। সরযূ-সলিলে স্বল্পবাসা ললনাদের জলবিহার শুরু হ'ল। অযোধ্যাধিপতি কুশ নৌকারোহণ করে সেই সুন্দরী নিতম্বিনী-কামিনী-দের এক কাম-কাতর কটাক্ষে দেখতে লাগলেন সব-কিছু ভুলে গিয়ে। জলকেলিতে উন্মত্ত ললনাদের সিক্ত-কুঞ্চিত বসন, গুরু-নিতম্ব, পীন-পয়োধর দেখে কুশের ধৈর্য ভাঙল। তিনি সব ভুলে গেলেন। নৌকা থেকে নামলেন সরযূর জলে। কামনা-বাসনার চরম আহ্লাদে সরযূর বুকে চলল কুশের জলবিহার, বনিতাবিহার, এক নির্লজ্জ ব্যভিচার।

মহারাজ কুশ সব ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন—ইক্ষ্বাকুবংশের সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে সরযূর কি সম্পর্ক! ভুলে গেলেন, সূর্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক তাঁর পিতৃদেব রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্তের সেই ইতিহাস —সরযূর আশীর্বাদের সেই অলৌকিক কাহিনী। ভুলে গেলেন, সরযূ নদী শুধু নদীই নয়, সে তাঁদের বংশের ও দেশের মাতৃস্বরূপা, স্নেহধারা-বর্ষিণী-মূর্তিমতী শান্তির দেবী। ভুলে গেলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা-সৃষ্ট, মানস

সরোবর-সঞ্জাত পবিত্র সরযূমাতার বুকের উপর ভেসে, ঐভাবে মদন-মর্দনে বারবনিতাদের উপভোগ করা যায় না! মহারাজ কুশের সেইসব ভুলে-যাওয়া ইতিহাসের মধ্যেই বেদনামন্দ্রিত সরযূর অবমাননা, রঘুবংশের পতনের বীজকে করেছে অঙ্কুরোদ্‌গামী—করেছে শক্তিশালী—করেছে সেই অঙ্কুরের বর্ধমানে এক অভিশপ্ত-সহযোগিতা।

সূর্যাস্তের আলোয় : রামচন্দ্রের বংশধরেরা

সরযূ নদীকে সোপান বানিয়ে রামায়ণের মহানায়ক রামচন্দ্র মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেলেন। আর তারই সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যও শেষ হয়ে গেল। একমাত্র দশরথ ছাড়া রামায়ণে রামচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলা হয় নি। সেখানে সেই পূর্ব-পুরুষদের সামান্য একটি পরিলেখ আছে মাত্র। আর রামচন্দ্রের উত্তর-পুরুষদের সম্পর্কে রামায়ণ সম্পূর্ণই নীরব। কারণ অবশ্য আছে। "রামায়ণ" মহাকাব্যের নামকরণটির দিকে তাকালে এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। রামের অয়ন, অর্থাৎ—রামের পথ। যে-পথে রামের জন্ম-মৃত্যু ও কর্ম-সাধনার বিস্তারপর্ব, সেটাই রামায়ণ। তাই রামায়ণে রামচন্দ্রের উত্তর-পুরুষদের সম্পর্কে কিছু বলার কোন সুযোগও নেই। রামায়ণের মতে, সূর্যবংশের শেষ নরপতি, মহামানব রামচন্দ্র। কিন্তু বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে রামচন্দ্রের দুই পুত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত জানিয়েছেন। সুতরাং রামায়ণ প্রমাণ করে না যে, রামচন্দ্রের বংশ লোপ হয়ে গেল। কুশ ও লবের জন্ম রাজপ্রাসাদেই হ'ক আর তমসার তীরে মুনির আশ্রমেই হ'ক, তবু তাঁরা রামচন্দ্রেরই পুত্র। সুতরাং ঐ দু'জন সূর্যবংশেরই প্রতিনিধি ও অযোধ্যার রাজসিংহাসনের অধিকারী।

রামায়ণের যুগ থেকে বহু শত বছর পরে সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সুবর্ণযুগে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব হয়েছিল। কালিদাসের একাধিক কাব্য-নাটকের মধ্যে পরিণত প্রতিভার সংস্করণ তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্য। এই রঘুবংশ কাব্য বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। বাল্মীকি সূর্যবংশের শেষ নৃপতির কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সূর্যবংশের লোপের কথা বলেন নি। আবার দশরথ ছাড়া রামের পূর্ব-পুরুষদের কথাও আদিকবি বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি। এখানেই কালিদাস 'রঘুবংশ' রচনাকার্যের পরিধিকে তাঁর স্বচ্ছ কাব্য-ভাবনার মধ্যে খুঁজে পেলেন। বাল্মীকির সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য নয়, বিশ্বসাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজনের প্রয়োজনে।

এই নতুন অধ্যায়টির জন্য তাঁর প্রথম ঋণ রামায়ণের কাছে, আর তার-পরের অবলম্বন বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ।

'রঘুবংশ' খুব বড় কাব্য। সবদিক দিয়েই বড় মাপের কাব্য। তাই এর মহাকাব্যে উত্তরণ। উনিশটি সর্গ আর ১৫৬৯টি শ্লোকের সমন্বয় হয়েছে এই মহাকাব্যের সামগ্রিক পরিধিতে। রামায়ণে বাল্মীকি যেখানে কম কথা বলেছেন, সেখানে কালিদাসের চিন্তাভাবনা বিস্তৃত হয়েছে। আর যেখানে বাল্মীকি অনেক কিছু বলেছেন, সেখানে রঘুবংশকার তাঁর লেখনীকে হাল্কা মেঘের মতো ভাসিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। বাল্মীকির অননু-করণীয় অনুসরণে কালিদাস এক গহন অরণ্যকে সাজানো বাগানে পরিণত করেছেন।

কুশ ও লবের জন্ম দেখিয়ে রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর রামায়ণ শেষ হয়ে গেল। কালিদাস তাঁর রঘুবংশে কুশ ও লবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের তিন ভাইয়েরও দুটি করে পুত্রসন্তান জন্মের সংবাদ দিলেন এবং রামচন্দ্রের নির্দেশে, তাঁর জীবদ্দশায় কুশ-লবসহ ছয় ভাইপো, অযোধ্যার কেন্দ্রীয় শাসনের পরিবর্তে আটটি স্বাধীন অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভ করলেন। ঐ আট ভাইয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কুশ, কুশাবতী নগরীর রাজত্ব লাভ করে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অযোধ্যানগরী নিষ্প্রাণ মৃতদেহের মতো পরিত্যক্ত হ'ল। পিতৃ-পুরুষদের এত সাধের প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা নির্জন শ্মশানের মতো হয়ে গেল। রামচন্দ্রের প্রথম উত্তর-পুরুষ কুশ এখন মহারাজ হয়েছেন। রঘুবংশের ষোড়শ সর্গ, মহারাজ কুশের রাজত্ব থেকে শুরু হ'ল। এই ষোড়শ সর্গের উদ্বোধনী শ্লোকে কালিদাস অত্যন্ত শিল্পনৈপুণ্যের মাধ্যমে রামচন্দ্রের উত্তর-পুরুষদের একটা চারিত্রিক সংকেত দিয়েছেন। কবি বললেন— 'রামের তিরোধানের পর কুশের অপর সাত ভাই রাজ-সংসারের যেগুলি বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু সেগুলির সদব্যবহারের জন্য 'রত্ন বিশেষ ভাজন' কুশকে রাজত্ব চালাবার অধিকার দিয়েছিল।' কুশ থেকে রঘু-বংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত মোট তেইশজন রাজা অযোধ্যার সিংহাসন অলংকৃত করে 'রত্ন বিশেষ ভাজন' আত্মকেন্দ্রিকতার সংক্রামক-ব্যাধিতে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন।

কুশাবতী নগরীতে বসে মহারাজ কুশ স্বেচ্ছাধীন রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে রাজ-সংসারের উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর সদ্ব্যবহারে রাজত্ব কর-

ছেন। নৃত্য, গীত, প্রমোদভ্রমণ, বারবণিতাদের সঙ্গে বিহার, মদ্যপান—এই বিশেষ বিশেষ রত্নের ভজনায় কুশ এখন নিরংকুশ স্বাধীনতার ছাড়-পত্র পেয়ে গেছেন। সূর্যবংশের মূল সম্পদ প্রজানুরঞ্জন এখন সরযূর অতলে নিরুদিষ্ট। পরিত্যক্তা, শ্রীহীনা প্রাক্তন রাজধানী অযোধ্যানগরীর কথা চিন্তা করে কবির বড় করুণা হ'ল। কুশের চিত্ত পরিবর্তন না হ'ক, বিবেক দংশনের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে মনে করে কবি কালিদাস তাঁর বাঙময়ী পরিকল্পনার সাহায্যে অনাথা অযোধ্যানগরীর রাজলক্ষ্মীকে এক বিষণ্ণ, লালিত্যশূন্যা রমণীর রূপে সাজিয়ে গভীর রাত্রে সকলের অগোচরে নিদ্রামগ্ন কুশের অবচেতন মনের ওপর একটা স্বপ্নদর্শনের ছায়ালেখ্য এনে ফেললেন। সেই বিষাদ-করুণ নারীমূর্তি স্বপ্নে কুশকে পিতৃপুরুষের চিরন্তন রাজধানী অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেবার অনুরোধে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কুশের স্বপ্নদর্শন, বিবেক দংশনের কাজ করল। রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতির বিবেচনা করে মহারাজ কুশ সদলবলে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। অযোধ্যা প্রত্যা-বর্তনের সময়ে কবি আমাদের আরেকটি কথাও শোনালেন—"কামীব কান্তা হৃদয়ং প্রবিশ্য··· (র-১৬/৪০)।" কামীব্যক্তি যেমন কান্তার হৃদয়ে প্রবেশ করে, কুশও সেরূপ অযোধ্যা প্রবেশ করলেন। এবার কবি-নাট্যকার কালিদাস কুশ-চরিত্রের স্বরূপ প্রত্যক্ষে প্রকাশ না করার অজুহাতে, অযোধ্যা-প্রকৃতিতে নাটকীয়ভাবেই গ্রীষ্মঋতুর অবতারণা করলেন। নিদাঘের নগ্ন-তপ্ত প্রতীকের সঙ্গে কুশের নগ্ন-তপ্ত কামকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে দিয়ে প্রত্যক্ষে কুশ-নিন্দার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করলেন। গ্রীষ্মের তাপে সরোবরের জল নেমে গেল। রাজপ্রাসাদের বিলাসবহুল স্নানাগারে যন্ত্রচালিত জলধারায় জলকেলি করা সম্ভব নয়। তাই সেই প্রবল গ্রীষ্মে কুশের সরযূ নদীর কথা মনে পড়ল। বনিতাবেষ্টিত হয়ে মহারাজ সরযূর বক্ষে বিহার করতে মনস্থ করলেন। নৌকায় চড়ে সরযূর বুকে ভ্রমণ করতে করতে রাজা দেখলেন সুন্দরী ললনাদের জলকেলি। তাদের গুরুনিতম্ব ও পীন-পয়োধরের ভারে তারা ঠিকভাবে সাঁতার কাটতেও পারছেন না। জলবিহারিণীদের কান থেকে শিরীষফুলের অলংকার জলে খুলে খুলে পড়ছে। কামিনীদের সিক্ত বসন অঙ্গে এঁটে গিয়ে তাদের রক্ত-মাংসের দেহ ভাস্কর্যের মূর্তির

মতো রূপ নিয়েছে ! কুশের ধৈর্য ভেঙে গেল। নৌকা থেকে তিনিও নামলেন, ঐ বারবনিতাদের সঙ্গে জল-ক্রীড়ার উন্মাদনায়। সরযূর পুণ্য-সলিলে চলল কুশের কাম-তাড়িত সম্মান-লাঞ্ছিত, বনিতা-বেষ্টিত, মদন-মর্দনে এক উন্মাদনাময় জলকেলি। সরযূ সমগ্র সূর্যবংশ তথা অযোধ্যা নগরীর নদী-মাতৃকত্ব লাভ করেছে। যে-সরযূর আশীর্বাদে রামচন্দ্রের জন্ম এবং যে-সরযূর পুণ্যসলিলে রামের দেহলীন হয়েছে, সেই পুণ্যতোয়া সরযূমাতার বুকে রামচন্দ্রের প্রথম উত্তরপুরুষ মহারাজ কুশ বারবনিতা-দের নিয়ে মদন-মর্দনে জলক্রীড়া করছেন।

বর্ধিষ্ণু রাজবংশের রাজপ্রতিনিধিদের, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধযাত্রার রীতি তৎকালীন পৌরাণিক সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এছাড়া মৃগয়াযাত্রাও তাঁদের প্রচলিত রীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুশকেও যেতে হয়েছিল দেবাসুরের যুদ্ধে। যুদ্ধে যাবার আগেই কুশ ঘোষণা করে গেলেন, আমি যদি আর না ফিরি, তবে আমার পুত্র অতিথি সিংহাসনে অভিষিক্ত হবে। "যদি না ফিরি"—এই কথাটিই কুশের জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এনে দিল। যুদ্ধে দুর্জয় নামক অসুরকে বধ করতে গিয়ে কুশ নিজেই দুর্জয়ের হাতে বধ হয়ে গেলেন। আর সূর্যবংশের ইতিহাসের প্রথম নজির সৃষ্টি হ'ল—অসুরের হাতে মহারাজের প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়ে।

রঘু-বংশের সপ্তম নৃপতি কুলতনয় অতিথি মহারাজ হলেন। অতিথির মা কুমুদ্বতী ছিলেন কুশের অসংখ্য অবসর-সঙ্গিনীর একজন। এখানেও ভাবতে অবাক লাগে, সুদক্ষিণা, ইন্দুমতী, কৌশল্যা, সীতার আসনে কুমুদ্বতী—যাঁর কোন নির্দিষ্ট বংশ পরিচয়ই নেই। অতিথির পরবর্তী একুশজন নৃপতির ইতিহাস এক বিপুল ভাঙনের ইতিহাস। তাই কবি সেই শুধু আসা-যাওয়ার পালায় অবতীর্ণ রঘুবংশের শেষ নৃপতিদের একটু দাঁড়াবার মাটি তৈরী করার জন্যই হয়তো কুশ-পুত্র অতিথিকে কিছুটা রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দান করেছেন। তা না-হলে, ক্ষত-বিক্ষত কুশের তৈরী মাটির ওপর ঐ একুশজন রাজা দাঁড়াতেই পারতেন না। নবীন বয়স, অপরিমিত সম্পদ, অনিন্দ্যনীয় রূপ—এই সই ক'টি গুণই মহারাজ অতিথির বর্তমান ছিল। কিন্তু তাঁর উদার হৃদয়ে কোন গর্ব বা মত্ততা পরিলক্ষিত হয় নি। কবি আরও বললেন, অতিথির সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না, কিন্তু কখনও তিনি অপথে বা কুপথে যান নি। অযোধ্যা রাজ-

লক্ষ্মীর অতিথির প্রতি আনুকূল্য, ত্রিকালদর্শী কুলগুরুর প্রতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধা, পর্যাপ্ত বিলাসের মধ্যে থেকে মহারাজের প্রজ্ঞা-সমুজ্জ্বল সংযম ও প্রজাসাধরণের ওপর বিশ্বাস ও কর্তব্যজ্ঞান অতিথিকে তাঁর পূর্বপুরুষদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নজীর রচনা করতে সাহায্যই করেছে।

কিন্তু রঘুবংশের নিয়তি বড় সজাগ। সাহিত্যের মধ্যে রাখাই তার স্রষ্টার মূল উদ্দেশ্য। কাব্যের আত্মাকে তিনি ধর্মের সোপান-পথে ঠেলে দেন নি। বাস্তববাদী, পরিণামমুখী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসেই হয়তো কবি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সুরে পাঠকদের শোনালেন—কুশের পাপবিদ্ধ অশরীরী আত্মা অযোধ্যাকে নিঃশেষ করতেই ব্যস্ত। তাই "অতিথি" আক্ষরিক অর্থেও যেন খুব কম সময়ের এক সত্তা। "ক্ষণিকের অতিথি"র মতই মঙ্গলময় মহারাজ অতিথি অকালে পরপারের পথে পাড়ি জমালেন।

শুরু হল রঘুবংশের লঘুযাত্রা আর কাব্যের অষ্টাদশ সর্গের বর্ণনা। এই অষ্টাদশ সর্গে মাত্র পঁয়ত্রিশটি শ্লোকেই তিনি একুশজন নরপতির বর্ণনা শেষ করে ফেললেন। কারণ, এই একুশজনের কথায় কাউকে শোনাবার মত কিছু নেই। শোনালেও নৈতিক শিক্ষার অগ্রগতি নেই। জগতে অসংখ্য, নগণ্য, অপরিণামদর্শী মানুষ যেমন জন্মায় ও মরে, রঘুবংশের এই একুশজন নৃপতিও ঠিক একইভাবে—"কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি", এই প্রবাদবিরোধী চরিত্রের প্রতীক হয়ে চলচ্চিত্রের মতই মঞ্চে রাজা সেজে এসেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছেন। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার মেলায় ঐ রাজাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণিত না-হলেও কবি ঐ একুশজনের চরিত্রকে শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের প্রতীকে ফেলে সেই রাজার পরিপূর্ণ হতমান-ইতিহাস উনিশ সর্গের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় পাঠকদের এক আকুল-আর্তিতে, হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়ে যেন শুনিয়ে দিয়েছেন। অগ্নি-বর্ণের সেই ব্যাভিচারের ইতিহাস, ঐ একুশজনের সত্য-অশ্রুত এক ইতিহাস।

অতিথির অকাল মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নিষধ রাজা হলেন। নিষধের আর কোন সংবাদ না জানিয়েই কবি নিষধনন্দন নলকে সম্রাট হিসাবে চিহ্নিত করলেন।' অনুরূপভাবে নলপুত্র নভঃ রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হলেন। নভের বর্ণনায় কবি শুধু বললেন, স্বর্গীয় গন্ধর্ব ও অপ্সরা-রা

নভের খুব প্রশংসা করত। অর্থাৎ নভের নৃত্যগীত বোধহয় নিত্যসঙ্গী ছিল। নভের পর আসলেন তাঁর পুত্র পুণ্ডরীক। এরপর পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা রাজা হলেন। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক। দেবানীকের খ্যাতি তাঁর সাম্রাজ্যে খুব একটা ছিল না। কিন্তু দেবলোকের পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন মহান। দেবানীকের পুত্র অহীনগু। অহীনগু সম্পর্কে কবি দুএকটি কথা শুনিয়েছেন। ইনি ছিলেন বিনয়ী, মিতব্যয়ী এবং মনোবল ও বাহুবলের অধিকারী। সন্মার্গ ভজনা ও নিজের নামের বাস্তব-দ্যোতনায় তিনি ছিলেন সার্থক। তিনি হীনমন্য ছিলেন না। এরপর এলেন পারিযাত্র। পারিযাত্রের পর শিল রাজা হলেন। শিল রাজা হলেন, পারিযাত্রের মৃত্যুর আগেই। কারণ শিলের পিতা পারিযাত্র বাণপ্রস্থে না গিয়ে কাম-প্রস্থানে সুন্দরী বিলাসিনীদের সঙ্গে সম্ভোগে মেতে উঠলেন।' শিলের পুত্র উন্নাভ। উন্নাভের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বজ্রনাভ অযোধ্যার অষ্টাদশতম সম্রাট হলেন। বজ্রনাভের পুত্র শংখন। শংখনের পুত্র পৈতৃক রাজা হয়েই সমুদ্রের বেলাভূমিতে সশস্ত্র সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলেন।' মনে হয় তিনি অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন।' এই অপকর্মের জন্য পুরাতাত্ত্বিকরা পৈতৃককে ব্যুষিতাশ্ব আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্যুষিতাশ্ব কথার অর্থ সৈন্য ও অশ্বরচয়িতা। ব্যুষিতাশ্বের পুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ।' হিরণ্যনাভের পুত্র কৌসল্য রাজা হলেন। সেই কৌসল্য ছিলেন অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও ব্রহ্মাভক্ত। তাই ব্রহ্মানুগামী মহারাজ কৌসল্য তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন ব্রহ্মিষ্ঠ। ব্রহ্মিষ্ঠের পুত্রের নাম পুত্র। পুত্রের তনয় পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির অন্যতম পূর্বপুরুষ রামচন্দ্রের পুত্র মহারাজ কুশ দুর্জয়-দৈত্য বধ করতে গিয়ে সেই দৈত্যের হাতে নিহত হয়েছিলেন। আর সেই কুশের যোগ্য একুশতম বংশধর অযোধ্যাপতি ধ্রুবসন্ধি রাজন্যবর্গের অন্যতম বিলাস মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহের পেটেই চলে গেলেন। কুশের পর থেকে রঘুবংশের রাজন্যদের পালা বদলে যেন মরুভূমির ঝড় বয়ে চলেছে। ধ্রুবসন্ধির মৃত্যু সংবাদে একটি রাজবংশের দুর্বলতম অবক্ষয়ের চিত্রটি কবি জানালেন এইভাবে—"···মৃগয়াতাক্ষো মৃগয়াবিহারী, সিংহাদ্ অবাপ দ্বিপদং নৃসিংহঃ"। (রঃ ১৮/৩৫)। —"নরকুলে সিংহবিক্রম ধ্রুবসন্ধি মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহের মুখে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।" ধ্রুব-সন্ধির প্রতি কবির "নৃসিংহ" বিশেষণটি কটাক্ষ উপহাসের এক শাণিত

অস্ত্রের কাজ করেছে।

এবার ইতিহাসের অন্তর্নিহিত আলোকে কবির কথা ভাষা যাক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহান নরপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শেষের দিকের বংশধর পুরগুপ্তের পুত্র, নরসিংহ গুপ্ত, বিক্রমাদিত্য-এর পরিবর্তে বালাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁর হীনবীর্যতাই প্রমাণ করে। কবি তাঁর রঘুবংশের অষ্টাদশসর্গে গুপ্তযুগের বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তকে সুন্দরভাবে কটাক্ষ করলেন, পুষ্যের পুত্র এবং সুদর্শনের পিতা ধ্রুবসন্ধির বর্ণনা করতে গিয়ে। 'নরসিংহ মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহের হাতেই প্রাণ হারালেন এই বক্তব্যে ধ্রুবসন্ধি প্রসঙ্গে নৃসিংহ কথাটি গুপ্ত-বংশের• অকীর্তিকর সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যকেই সূচিত করেছে ব'লে মনে হয়। কারণ বালাদিত্য উপাধি নিশ্চিতভাবেই মধ্য-গগনের তেজ ও উজ্জ্বলতা নির্দেশ করে না। তাইতো শেষ বয়সের কবির রাজা-নুকূল্যের তীব্র অভাব রঘুবংশের ছায়ায় ধরা পড়ে গেল।

সিংহের হাতে ধ্রুবসন্ধির অকাল-অপমৃত্যুতে তাঁর বালক পুত্র সুদর্শন অপরিণত বুদ্ধি নিয়ে রঘুবংশের আঠাশতম ও রামচন্দ্রের বাইশতম উত্তর-পুরুষ হিসাবে অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করলেন। মহারাজ কুশ দেবাসুরের যুদ্ধে যাবার পূর্বে তাও বলে গিয়েছিলেন 'যদি না ফিরি তবে আমার পুত্র অতিথি সিংহাসনে অভিষিক্ত হবে'—কিন্তু ধ্রুবসন্ধি সেকথা বলারও অবকাশ পেলেন না। রাজতন্ত্রের অবসানকল্পে কবির কি সূক্ষ্ম প্রয়োগপরিকল্পনা। কবি যেন ইচ্ছে করেই একুশজন 'রাজা সাজার রাজা'কে মঞ্চে এনে তারপর বালক নৃপতি সুদর্শনকে ছেলেখেলা রাজ-তন্ত্রের দায়িত্বে বসিয়ে দিলেন। সুদর্শনের কথা বলতে গিয়ে কবি যেমন কটাক্ষের উপাদান সাজিয়েছেন আবার নিভৃতে অশ্রুমোচনের চেষ্টাও করেছেন। পিতৃহীন বালক সুদর্শন যে রাজবংশের সন্তান সেই বংশের প্রথম দিককার নৃপতিরা ছিলেন প্রজাসাধারণের কাছে পুত্রহীনের পুত্র পিতৃহীনের পিতা, অনাথের নাথ। আর আজ সুদর্শন নিজেই পিতৃহীন অনাথ বালক। তাই অনাথ রাজা যখন সিংহাসনে বসলেন তখন কবি স্বকৃত-আলেখ্যের অসংলগ্ন রূপরেখা দেখে বেদনায় বিমূঢ় হয়ে তাঁর পাঠকদের শোনালেন, 'আ-সমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত বর্ধিষ্ণু সুবর্ণযুগের রঘু-বংশে শিশু নৃপতি সুদর্শন এসে যেন বিস্তৃত অনন্ত আকাশের একফালি চাঁদের মত, গভীর অরণ্যের একটি সিংহশাবকের মত, সুবৃহৎ সরোবরের

কমল-মুকুলের মত—বৈসাদৃশ্যের প্রতীকে শোভা পেতে লাগলেন। (রঃ ১৮/৩৭)।'

আরও উল্লেখযোগ্য এই বালক-নৃপতির পা-দুটিও সিংহাসন থেকে মাটিতে এসে ঠেকত না। রাজার পাদুটি মাটির ওপরে দুলতো, ঝুলতো। সেই সুদর্শন ধীরে ধীরে বড় হলেন। বড় হওয়ার পথে পারিপার্শ্বিক কোন নৈতিকতাই তাঁকে উদার হতে সাহায্য করল না। তাই যৌবনের মদন-সন্নিবন্ধতায় তিনি অনুরাগময় হয়ে উঠলেন। অদূরপ্রসারী অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে অপত্য কামনায় বহুপত্নীক হলেন। তারপর জনৈকা রত্ন-গর্ভামহীষীতে তাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণের জন্ম দিয়ে অসুস্থ অবস্থায় প্রৌঢ়ত্ব, পার করে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হলেন। অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রের উত্তর-পুরুষ (২৩তম) অগ্নিবর্ণ বসলেন রাজা হিসাবে।

এই অগ্নিবর্ণ ই সূর্যবংশ তথা রঘুবংশের শেষ সম্রাট এবং রামচন্দ্রের শেষ উত্তরপুরুষ। অগ্নিবর্ণ রাজা হয়েই মন্ত্রিবর্গের ওপর রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে নিজেকে কামনার কারাগারে বন্দী করে ফেললেন।' যৌবন মদমত্ততায় বহু পত্নী গ্রহণ করলেন। অসংখ্য বারবনিতার সঙ্গে নিজেকে নিঃসংকোচে জড়িয়ে ফেললেন। এ ছাড়া অগণিত প্রেয়সী তাঁর রাত্রি-বাসের শয্যা-সঙ্গিনী হয়ে অগ্নিবর্ণকে ভাগাড়ের মৃতদেহের মতো কামনার অত্যাচারে লুটে-পুটে খেতে লাগল। তার ওপর চলল অবিরত মদ্যপানের ফোয়ারা।

শরীরের নাম মহাশয়—ঠিক কথা, কিন্তু এত সইবে কেন ? তাই অনিয়মিত জীবনের অংশীদার কামজ্বরগ্রস্ত মহারাজ অগ্নিবর্ণ একদিন দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলেন।' বহুপত্নী থাকা সত্ত্বেও তিনি পিতা হতেও সক্ষম হলেন না।

অনিয়মিত পথ্য ও ওষুধের সেবনে অনীহা, অসুস্থ শরীরেও নিয়মিত মদ্যপান ও নিত্য-নারীসঙ্গে ব্যস্ত থাকার ফলে একদিন জীর্ণ, শীর্ণ, রোগ-গ্রস্ত, অকালবার্ধক্যের ক্লেদাক্ত দেহটি নিঃশেষ হয়ে গেল। নিঃসন্তান অগ্নিবর্ণের উত্তরপুরুষের অভাবে রঘুরাজার বংশও লোপ পেয়ে গেল। সূর্যবংশের সূর্যাস্ত হল অগ্নিবর্ণের চিতাভস্মের ওপর। রামচন্দ্রের উত্তর-পুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষদের এই ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন কিন্তু রামায়ণ নয়। কালিদাস স্বয়ং এর রচয়িতা আর কিছু সাহায্য নিয়েছেন,

বিভিন্ন পুরাণ থেকে। সেই পুরাণগুলি হল, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ, গরুড়পুরাণ, কল্কিপুরাণ ও বায়ুপুরাণ। মোট ছয়টি পুরাণ থেকে কালিদাস শুধু রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষদের নামের ক্রমানুসারী তালিকাটি পেয়েছেন। আর ঘটনাবলী, কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল-শ্রুতি। রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষদের ক্রমিক তালিকাটি বিভিন্ন পুরাণের অভিব্যক্তিতে কিরকম ছিল সেটা উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক—বিষ্ণুপুরাণ : হিরণ্যনাভ, পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র, মরু।

দুই—ভাগবতপুরাণ : হিরণ্যনাভ, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র, মরু।

তিন—হরিবংশ : শংখ ধূষিতাশ্ব, পুষ্প. বিদ্বান, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র, মরু।

চার—গরুড়পুরাণ : হিরণ্যনাভ, পুষ্পক, ধ্রুবসন্ধি. সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, পদ্মবর্ণ, শীঘ্র, মরু।

পাঁচ—কল্কিপুরাণ : পুষ্প, ধ্রুব স্যন্দন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র, মরু।'

ছয়—বায়ুপুরাণ : শংখ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, পুষ্য, বিদ্বান, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র, মরু।

আর রঘুবংশের তালিকা—নিষধ, নল, নভঃ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনগু, পারিযাত্র, শিল, উন্নাভ, বজ্রনাভ, শংখন ব্রহ্মিষ্ঠ পুত্র পুষ্য ধ্রুবসন্ধি সুদর্শন অগ্নিবর্ণ।

রঘুবংশের নিষধ থেকে বজ্রনাভ পর্যন্ত এগারোজন নৃপতির নামের তালিকা পুরাণগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রঘুবংশের উনিশতম নৃপতি শংখনের নাম হরিবংশ ও বায়ুপুরাণে শংখ নামে নির্দেশিত হয়েছে। রঘু-বংশের বিংশতিতম নৃপতি পৈতৃক, নামান্তরে ব্যুষিতাশ্ব, হরিবংশ ও বায়ু-পুরাণে ব্যুষিতাশ্ব নামে পরিচিত হয়েছেন। গরুড়পুরাণ, পুষ্পক ও কল্কি-পুরাণ, পুষ্প নামে রাজার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রঘুবংশ ও অন্যান্য পুরাণ পুষ্প নামে কোন রাজার কথা লেখেন নি। কিন্তু রঘু বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ পুষ্য নামে এক রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, পুষ্পক, পুষ্প ও পুষ্য একই ব্যক্তি। শাব্দিক অপভ্রংশের গতিতে পুষ্যতে পরিণত হয়েছে।

রঘুবংশের একুশতম নৃপতি, হিরণ্যনাভের নাম, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগ-

বতপুরাণ ও গরুড়পুরাণে দেখা যায়। রঘুবংশের সাতাশতম নৃপতি ধ্রুবসন্ধি, তাঁর পুত্র সুদর্শন ও সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ ধ্রুবসন্ধি সুদর্শন অগ্নিবর্ণের ক্রমটি, সব পুরাণেই সমভাবে গৃহীত হয়েছে। ধ্রুবসন্ধির পুত্র যে সুদর্শন, এ পরিচয় সর্বত্রই স্বীকৃত।' একমাত্র কল্কিপুরাণ, ধ্রুবসন্ধির পুত্র হিসাবে স্যন্দনের নাম উল্লেখ করেছেন। স্যন্দনই যে সুদর্শনের শাব্দিক পরিপূরক তা বলা বাহুল্য। কালিদাস অগ্নিবর্ণে বংশ লোপ করে রঘুবংশে সমাপ্ত করেছেন। অন্যান্য সব পুরাণই অগ্নিবর্ণের পর দুজন নৃপতির যথাক্রমেশীঘ্র ও মরু—নামোল্লেখ করেছেন।' মনে হয় কালিদাসের কালে উক্ত পুরাণগুলিতে ঐ শেষোক্ত রাজা দুজনের নাম বর্তমান ছিল না। কালিদাসের পরবর্তীকালে পুরাণগুলিতে শীঘ্র ও মরু প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার পুরাণকার সর্বত্রই মরুকে শেষ রাজা দেখিয়ে সূর্যবংশের লোপ করিয়ে দিয়েছেন। সব পুরাণেই বিশুষ্ক মরুভূমির প্রতীক মহারাজ মরু নিঃসন্তান রূপে বর্ণিত হয়েছেন। সেই সূত্রেও নিশ্চিত যে মরুর পরে রামচন্দ্রের আর কোন উত্তরপুরুষ থাকতে পারে না। মরুতেই সূর্যবংশের সূর্যাস্ত ও রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষেরা নিশ্চিহ্ন।

দাশরথি রামের শেষ বংশধর

সীতার পাতাল প্রবেশের পর অযোধ্যার রাজনৈতিক ইতিহাসে, পরপর কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। প্রথমত, এক রাজার শাসনে রাজধানীর যে সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা, তা বিলুপ্ত হয়ে রাজ্য-রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ প্রথা চালু হয়। দাশরথি-বৃন্দের অর্থাৎ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত শত্রুঘ্নের, দুটি করে যথাক্রমে আটটি পুত্রকে ভারতবর্ষের আটটি অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর রূপে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। রামচন্দ্রের দুই পুত্র কুশ ও লব যথাক্রমে কুশাবতী নগরী ও শরাবতী নগরীর দায়িত্ব পেলেন। অনুরূপভাবে ভরতের পুত্রদ্বয় তক্ষ ও পুষ্কল. তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতীতে, লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, উত্তর ও দক্ষিণ কারাপথের এবং শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয় শত্রুঘাতী ও সুবাহু মথুরা ও বিদিশানগরীর শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষিত হলেন। বলাবাহুল্য এই বিকেন্দ্রীকরণ শাসন ব্যবস্থাটি কিন্তু স্বয়ং রামচন্দ্রের নির্দেশেই হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত লক্ষ্মণ-বর্জন পালা। রামের প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণের মৃত্যু সংবাদ, একটি বেদনার্ত দুর্ঘটনা। ঠিক তারপরেই রামচন্দ্রের সরযূ প্রবেশ। তিরোধান কিংবা পত্নীর শোকে আত্মহত্যা। রামের তিরোধানের পর বাল্মীকি রামায়ণ সমাপ্ত। এরপর রামচন্দ্রের বংশধরদের কাহিনী শোনালেন কবি কালিদাস, তাঁর রঘুবংশ কাব্যের শেষ পর্বে। প্রথমেই তিনি জানালেন, সীতার পাতাল-প্রবেশের পরই, সূর্যবংশের গৌরব-সূর্য অস্তমিত-প্রায়।

চার দাশরথির আট পুত্র সবাই জীবন ও যৌবনকে উন্মত্তের মত বেশ ক'দিন ভোগ করে, কুশের হাতে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। বংশানুক্রমিক ধারায় জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শাসনভার গ্রহণ করতে হয়—এই বিশিষ্ট-উপদেশটি, দাশরথির পুত্রেরা মান্য করলেন। রাজা কুশের পর অযোধ্যার সিংহাসনে আরও বাইশজন নরপতি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন নামেমাত্র রাজা। এই সময়টি প্রাচীন

ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। রাজাদের কাম, ক্রোধ, হিংসা ও অকর্মণ্যতায় সূর্যবংশ মৃতপ্রায়। অবশেষে সুমহান সূর্যবংশের শেষ নরপতি হিসাবে অভিষিক্ত হলেন, দাশরথি রামের শেষ বংশধর মহারাজ অগ্নিবর্ণ।

রাজার দায়িত্ববোধ, কষ্টসহিষ্ণুতা, বীর্যবত্তা রাজ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে বাহুবলের যথাযথ প্রয়োগ—এর কোনো কিছুই অগ্নিবর্ণের কাছে, রাজ্যভার গ্রহণের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে দেখা দিল না। কারণ, অগ্নিবর্ণ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করে সচিবদের হাতে রাজ্য অর্পণ করে, কামিনীকুলের অধীন, স্বয়ং কামনার কারাগারে বন্দী হয়ে গেলেন। তারপর শুরু আর্তসঙ্গীত—যার অভিশপ্ত মূর্ছনা রঘুবংশের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নারী, মদ আর ব্যাভিচারের শিথিল গতিতে, বিষাদময়-বীভৎস রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। মহাকবি কালিদাস জানালেন, 'ব্যভিচার-সর্বস্ব জীবন, মঙ্গলের আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না ; বিপুল-বিশাল রাজবংশের মধ্যে যদি একবার অনাচার প্রবেশ করে, তার ধ্বংস অনিবার্য।'

মহারাজ অগ্নিবর্ণের যৌবনের একমাত্র সাধনা—যৌন জিজ্ঞাসা। তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত—একাধিক স্ত্রী গ্রহণ। করলেনও তিনি তাই। শুধু বিবাহ-বন্ধনেই তাঁর কামনা চরিতার্থ হল না। অন্তঃপুরের কামনা-তিমিরে, অসংখ্য গণিকার দেহ বিমর্দনে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। শয্যাত্যাগ থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত শুধু মোহময় কামনা-লালসায় কুক্ষিগত প্রাণ মহারাজ অগ্নিবর্ণ—অনুরক্ত প্রজাদের, বিশ্বাসভাজন অমাত্যদের, বয়োবৃদ্ধ সচিবদের ধীরে ধীরে অনেক দূরের মানুষের মতো সরিয়ে দিতে লাগলেন। প্রজারা মহারাজের দর্শন প্রার্থনা করলেও, পেত না। তবু তারা রাজার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করত না। কারণ, তারা বিশ্বাস করত, দেবাংশ-সম্ভব স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্রের পবিত্রবংশ জাত, রাজ-প্রতিনিধি অগ্নিবর্ণ, পাপের ভাগীদার হতে পারেন না।

হায় বিশ্বাস! হায় বাস্তব-কার্যকলাপ! সবই ইতিহাসের কুটিল-ভ্রূকুটির কাছে পরাজিত। তাই বার বিলাসিনী-প্রিয় অগ্নিবর্ণ উত্তরোত্তর নিজের সাধারণ-স্বভাবের পায়ে পায়ে, পাপ-পঙ্কিল-চক্রে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কামজ্বরগ্রস্ত উত্তপ্ত রাজা, নিদাঘের সূচনাতেই অন্তঃপুরের সরোবরে জলকেলির আনন্দে মেতে উঠলেন। কিন্তু একা নয়। উৎকট-

যৌবনা বারাঙ্গনাদের সাহচর্যে। সিক্তবসনা, অন্তর্বাসহীনা, উত্তুঙ্গযৌবনা বিলাসিনীদের সুঠাম ভাস্কর্যময় দেহবল্লরীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন মহারাজ। কাকে ছেড়ে কাকে ধরেন—তার হিসাবে গরমিল করে ফেলেন তিনি। ব্যক্তিত্বহীনের মত সবাইকে একসঙ্গে পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসে নিজেই হন লজ্জিত। তারপর গণিকাদের সঙ্গে মদ্যপানে প্রবৃত্ত হন। তাদের উচ্ছিষ্ট আসবপানে মিথ্যা তৃপ্তি লাভ কবেন। হায় সূর্যবংশাধিপতি! হায় মনু-রঘু-রামচন্দ্রের উত্তরসূরী! ইতিহাসের কি পরিণাম—অরমণীয় রমণ বিলাস!

নৃত্য-গীত-বাদ্যের সম্মিলনে সঙ্গীতের সৃষ্টি। এই সঙ্গীত স্বয়ং নাদব্রহ্ম। যা-সামদেবের সুরে আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে নারদের কণ্ঠ থেকে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর হৃদয়-মনে স্থিতিলাভ করেছে। সেই সঙ্গীত, সাধনার এক মহৎ ফল। সেই মনোরঞ্জনী-সঙ্গীত রাজ-দরবারের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু চরিত্রহীন মহারাজ সঙ্গীতের সাধনা করতে গিয়েও ব্যর্থ। নর্তকীদের নিয়ে সঙ্গীত সভায় নৃত্য চলাকালীন মুহূর্তে মদ্যপায়ী অগ্নিবর্ণ বেসামাল, ছন্দহীন, তাল-লয়-শূন্য সঙ্গীতের চর্চা করতে গিয়ে হতশ্রী। সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, নাট্যাচার্যগণ মনে মনে ব্যথা পেতেন, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করতেন না। নৃত্যরতা, ক্লান্তিচ্ছন্না নর্তকীদের অতি সন্নিকটে এসে মহারাজ তাদের স্বেদমর্মর গাত্রে ফুঁ-দিতেন, তাদের পরিশ্রান্ত দেহের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন। শিক্ষব্রতী-নর্তকীরা লজ্জা পেতো। নাট্যাচার্য-সঙ্গীতগুরুরা অপমানিত বোধ করতেন। কিন্তু রাজার এ-ব্যাপারে কেন হুঁশই থাকত না।

সম্ভোগের প্রধান ধর্ম, একমুখী-কামনার বিরোধিতা করা। তাই সম্ভোগের মূর্ত বিগ্রহ অগ্নিবর্ণ, নিত্যনতুন ভোগ্যবস্তুর অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে, তিনি বহুবল্লভ হয়েও প্রেমিক হতে পারলেন না। গণিকা গমনও যদি একমুখী ও একদেহী হয়, তা-হলেও সেখানে প্রেমের একটা প্রস্তুতিপর্ব চলতে থাকে, এবং যথাকালে সেটা শুদ্ধ প্রেমের পর্যায়ে পৌছতে পারে। গণিকা চিন্তামণির প্রেমে, কামুক বিল্বমঙ্গল, একমুখী-কামনার সৌজন্যেই সাধক বিল্বমঙ্গলে (মতান্তরে সুরদাস) উপনীত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু কাম-সাধনার ক্ষেত্রেও মহারাজ অসফল। তাই কামিনীদের কাছ থেকে বারবার অজ্ঞাতসারে প্রতারিত হয়েছেন। যে কোন বিষয়েরই পরিপূর্ণতা লাভ না হলে

বিষয়ীর সন্তুষ্টি আসে না। একইভাবে বহু রমণী-বল্লভ অগ্নিবর্ণকে তাঁর কামিনীরাও পছন্দ করত না। উপভোগের পূর্ণতা সৃষ্টির পূর্বেই গণিকারা মহারাজকে অপূর্ব-কামের আচ্ছেদ্যরজ্জুতে ঝুলিয়ে রাখত। কারণ, তারা মনে করত, রাজার আশা মিটে গেলে, আর তিনি আসবেন না। হয়তো অন্য রমণীর সন্ধানে ছুটবেন।

যে বারবধূদের মোহে মহারাজ, যশ-প্রতিপত্তি-রাজ্যশাসন সব ছাড়লেন—পরিবর্তে বারবধূরা কিন্তু মহারাজকে ছাড়ল না। চঞ্চল কামের এটাই পরিণতি। কামাগ্নিতে উত্তপ্ত মহারাজ, লজ্জাকে পুড়িয়ে, সম্ভ্রমকে জলাঞ্জলি দিয়ে সেই অতৃপ্ত কামনার বিক্ষুব্ধ মানসিকতায় অনুরাগবতী প্রেয়সীদের চোখে ধুলো দিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন। তাই ভোগবঞ্চিতা প্রণয়িনীরা তাঁকে শাস্তির চরম করে ছাড়ত। আঙ্গুল তুলে শাসাত, কুটিল নয়নে তাকাত, কামের অতৃপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে রাজাকে অভিশাপ দিত। তবু রাজার শিক্ষা হত না। উদ্‌ভ্রান্ত কামুক নরপতি আষাঢ়ের ঝোড়োহাওয়ার মত অন্ধ-মত্ততায় ছোটাছুটি করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। ইচ্ছাকৃত ছলনার আশ্রয় নিয়ে মহারাজ পূর্বপ্রতিশ্রুত কামিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য কামিনীর অন্দরে প্রবেশ করে তাকে হতচকিত করত এবং অনাবৃতের লজ্জায় ফেলে, নিজে পরম আনন্দ লাভ করতেন। এই দুরারোগ্য চরিত্র-দোষের ফলে মহারাজের ধর্মপত্নীরাও তাঁকে কোনদিনও প্রেমের চোখে দেখতেন না।

কি অদ্ভুত চরিত্র! রাজ-মহিষীদের কাছ থেকে প্রেম পেলেন না, প্রেয়সীদের কাছ থেকে শৃঙ্গারের আনুকূল্য লাভ করলেন না, গণিকাদের কাছ থেকেও কাম চরিতার্থ করতে পারলেন না। শুধু যৌনতার ইচ্ছা-সর্বস্ব মন-প্রাণ নিয়ে মরীচিকার পেছন পেছন ব্যথা নিঙড়ানো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে ছুটে বেড়ালেন!

নারীদেহ-প্রলুব্ধ রাজা পর্যায়ক্রমে সমস্ত ঋতুতেই অর্থাৎ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের সর্বদাই কামলীলার ব্যাভিচারে সময় কাটিয়ে দিলেন। মহাকবি কালিদাস, বসন্ত-বিদায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের শোনালেন,—"অপরাজেয় রাজশক্তির অখণ্ড প্রভাবে অন্য কোনো রাজা, অগ্নিবর্ণকে আক্রমণ করার সাহস করবেন না বটে, কিন্তু প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ যেমন চন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল, ঠিক সেইভাবে অত্যধিক অঙ্গনা-সম্ভোগের বিষময়

পরিণাম, অসাধ্য ক্ষয়রোগ ক্রমে মহারাজকে অতিশয় ক্ষীণ করে ফেলল।···

তারপর ?

তারপর আরেক চিত্র। ঔষধ-পথ্যে অনিয়মিত, সদা-সহচর স্ত্রী-মদ্য আর তিনি ত্যাগ করতে পারলেন না। অতি কামুকের যে-দশা হয়—সেই সুন্দর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হ'ল। কণ্ঠস্বর বসে গিয়ে স্বরভঙ্গ হ'ল। বৃদ্ধের সম্বল, লাঠি ছাড়া আর এক-পা-ও হাঁটা সম্ভব হ'ল না। দুর্বলতার জন্যে সর্বাঙ্গের রাজকীয় অলঙ্কার বেমানান হয়ে পরিত্যক্ত হ'ল। শূন্য হৃদয়, শূন্যদেহ রাজ-প্রতিনিধি অগ্নিবর্ণ—ত্রিজগদ্বিখ্যাত সূর্যবংশ ও অযোধ্যাকে কঙ্কালে পরিণত করলেন। দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে, বৈদ্য চিকিৎসকদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে সূর্যবংশের শেষ সম্রাট তথা দাশরথি রামের শেষ বংশধর অগ্নিবর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেলেন। বহু পত্নী থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিদারুণ অক্ষমতার জন্যে পুত্রমুখ দর্শন ভাগ্যে ঘটে উঠল না। বৈবস্বত মনুর শেষ প্রতিনিধির অকাল প্রয়াণে ও নিঃসন্তান অগ্নিবর্ণের উত্তরাধিকারীর অভাবে ভারতের এক—মহান রাজবংশের বিলোপ হয়ে গেল।